ধ্বংস-পাহাড়

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৬৬

এক

কফির কাপটা মুখে তুলতে গিয়ে থমকে গেলেন চীফ এঞ্জিনিয়ার আর.টি. লারসেন। সামনে দাঁড়ানো লোকটার মুখের দিকে চাইলেন ভুরু কুঁচকে। তারপর ভাঙা বাংলায় বললেন, 'বলো কি, আবদুল! এটা সম্ভব?'

ফ্রন্টিয়ারের আবদুর রহমান উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'হামি নিজে তিন দিন দেখছি, স্যার। কেউ হামার কোথা বিশওয়াস কোরে না। আখুন আপনার কাছে আইছি, হাজুর, কসম খোদার···'

'আমাকে দেখাতে পারবে?' ওকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লারসেন।

'আলবৎ! আর আধা ঘোন্টা পর আইবো তারা। উও স্পীডবোট হামাদের না, ফিশারীরও না। আজহি দেখাতে পারি, হাজুর!'

'বেশ, তুমি যাও। ঠিক সাতটায় আসছি আমি ড্যামের ওপর।'

খুশিমনে সাহেবের বাংলো থেকে বেরিয়ে এল আবদুর রহমান। একবার ভাবল, আজ যদি ওরা না আসে? বোকা বনতে হবে সাহেবের কাছে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে মনে মনে বলল—রোজ আসছে, আজ আসবে না কেন, নিশ্চয়ই আসবে।

কাপ্তাই বাঁধের কাজ শেষ, পাওয়ার হাউজ তৈরির শেষ পর্বের কাজ চলছে জোরেশোরে। তুমুল ব্যস্ততা, চারদিকে সাজ-সাজ রব, প্রেসিডেন্ট আসবেন ড্যাম ওপেন করতে। এরই মধ্যে এই ফ্যাঁকড়া।

আজ আট বছর ধরে প্রজেক্টের সারভে ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে আবদুর রহমান।

কাপ্তাইকে সে ভালবেসে ফেলেছে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। ওর চোখের সামনেই তিল তিল করে বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয়েছে এই বাঁধ। প্রজেক্টের খুঁটিনাটি ওর নখদর্পণে। ড্যামের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে লক্ষ রাখার গুরু দায়িত্ব ওর ধারণা ওরই উপর ন্যস্ত আছে। সীমান্ত প্রদেশের আবদুর রহমান এখানে এসে সবার প্রিয় আবদুল হয়ে গেছে। সাহেব সুবোরা স্পীড বোটে করে বেড়াবেন, কি পাহাড়ী গ্রাম দেখতে যাবেন, কিংবা ষাট মাইল উত্তরে যাবেন হরিণ শিকারে, সঙ্গে যাবে কে—ওই আবদুল। সবকিছুতেই ওর অক্লান্ত উৎসাহ। এই পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথায় সে যায়নি? চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে দুর্গম লুসাই হিলেও গিয়েছে সে সাহেবদের সঙ্গে।

ক'দিন ধরে একটা ব্যাপার লক্ষ করে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে আবদুল ভিতর ভিতর। আর দু'দিন পর প্রেসিডেন্ট আসছেন প্রজেক্ট ওপেন করতে। ছোট্ট শহরটায়

তাই অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। প্রচুর আই.বি., সি.আই.ডি. ঘুরঘুর করছে শহরের আনাচেকানাচে। কিন্তু আই.বি. কর্মতৎপরতা বলে এই ঘটনাকে হালকা করে দেখতে পারেনি সে। তাই যদি হয় তবে ভুড়ভুড়ি কিসের?

এক টিপ খইনি নিচের ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে যত্নের সাথে ছেড়ে দিয়ে সেটাকে ঠিক জায়গামত বসিয়ে নিল আবদুল। তারপর স্পিলওয়ের গার্ডরুমে ঢুকে দোনলা বন্দুকধারী দেশোয়ালী ভাইয়ের সাথে অনর্গল পশতু ভাষায় কিছুক্ষণ বাতচিত করল।

ঠিক সাতটায় দূর থেকে লারসেন সাহেবকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল আবদুল। সন্ধ্যার আর দেরি নেই।

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর রিজারভয়েরের মধ্যে দূরে একটা স্পীড-বোট দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন মি. লারসেন। উঁচু একটা টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। আরও আধ ঘন্টা পর আবদুলের কথামত সত্যিই পানির উপরে ছোট ছোট বুদ্বুদ দেখা গেল। শক্তিশালী টর্চ জ্বেলে দেখা গেল সেই টিলার দিক থেকে বুদ্বুদের একটা রেখা ক্রমেই এগিয়ে আসছে বাঁধের দিকে। গজ পনেরো থাকতে এগোনোটা থেমে গেল—এবার এক জায়গাতেই উঠতে থাকল বুদ্বুদ।

মি. লারসেন উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মাই গড়! আশ্চর্য! আবদুল, তুমি ছুটে যাও তো, স্টোর থেকে আমার নাম করে দুটো অ্যাকুয়া-লাঙ (ডুবুরীর পোশাক) নিয়ে এসো এক্ষুণি। আর যাওয়ার পথে লোকমানকে বলে যাও আমাদের স্পীড-বোট রেডি করে ঘর থেকে যেন আমার রাইফেলটা নিয়ে আসে। যাও, কুইক।'

দৌড় দিল আবদুল। ঠিক সেই সময়ে দূর থেকে একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শোনা গেল। সেই টিলার দিক থেকেই এল শব্দটা। ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দ—ফিরে চলে গেল স্পীড-বোট।

কাপ্তাইয়ের পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হাতের বামদিকে একটা মাটির টিলা—এখন রিজারভয়েরের পানি বেড়ে ওঠায় ডুবু-ডুবু। তারই ভিতর দামী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত একটা প্রশস্ত ঘর। একটা সোফায় বসে আছেন গৃহস্বামী কবীর চৌধুরী আর অপর একখানায় ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ মাদ্রাজী কর্মকর্তা মি. গোবিন্দ রাজলু। পাশের টিপয়ের উপর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে গোবিন্দ রাজলু বলল, 'অসামান্য প্রতিভা আপনার, মি. চৌধুরী। এই পাহাড়ের মধ্যে এত বড় একটা গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করলেন কি করে? এতসব যন্ত্রপাতি, এত রকম ব্যবস্থা! অথচ বাইরে থেকে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।'

এই অকুণ্ঠ প্রশংসায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে চৌধুরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইল রাজলুর চোখের দিকে, তারপর বলল, 'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি, মি. রাজলু। শুক্রবারেই ঘটবে ঘটনাটা।'

দেয়ালের গায়ে দুটো তাকের উপর থরে থরে সাজানো আছে বই। চৌধুরী উঠে গিয়ে একটা বোতাম টিপতেই দেয়ালের খানিকটা অংশ ঘুরে গেল। বইসুদ্ধ সামনের দিকটা অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনে, আর পিছন দিক থেকে সামনে চলে এল

একটা সি-সিটিডি, অর্থাৎ ক্লোজ্‌ড সার্কিট টেলিভিশন সেট। সেটটা চালু করে দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল চৌধুরী। গোবিন্দ রাজলু অবাক হয়ে দেখল পরিষ্কার কাপ্তাই ড্যামের ছবি দেখা যাচ্ছে টেলিভিশনে। এক আধটা গাড়ি সাঁ করে চলে যাচ্ছে বাঁধের ওপরের রাস্তাটা দিয়ে। সামনে থৈ-থৈ করছে জল, অল্প বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে সে জলে।

'রিজার্ভয়েরের জল এখন কতখানি?' জিজ্ঞেস করল রাজলু।

'সী-লেভেল থেকে ৯৯ ফুট। এটা সারভে অভ পাকিস্তানের হিসাব। ড্যামের হিসাব অবশ্য আলাদা—ওরা সী লেভেলের নয় ফুট নিচ থেকে ধরে। ওরা বলবে এখন ১০৮ ফুট।'

'আচ্ছা, পুরো ড্যামের ফিল্‌ ম্যাটেরিয়াল কতখানি? মাত্র তিনটেতেই কাজ হয়ে যাবে বলে মনে করেন?'

'ফিল্‌ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে পনেরো কোটি ছেষট্টি লক্ষ আশি হাজার সি.এফ.এস.। হ্যাঁ, আমার মতে তিনটেই যথেষ্ট। মেইন ড্যামটা দু'হাজার দু'শো ফুট লম্বা; আর চওড়া হচ্ছে, ওপরটা বাইশ ফুট—নিচটা একশো পঁয়তাল্লিশ ফুট। তিনটে জায়গা ভেঙে দিতে পারলে বাকিটা আপনিই উড়ে যাবে। তাছাড়া দেখুন, স্পিলওয়ের ষোলোটা গেট—প্রতিটা বত্রিশ বাই চল্লিশ ফুট—আমার লোক সব ক'টা লক গেট সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে সরে পড়বে সবাই যখন প্রেসিডেন্টের ওপেনিং নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে। এছাড়াও পাওয়ার হাউসের টানেল ডায়ামিটার হচ্ছে বত্রিশ ফুট হর্‌স্‌শ্যু—সেখান দিয়েও বেরোচ্ছে পানি। সবটা মিলে মোট এফেক্ট হচ্ছে এক কথায় যাকে বলে ডিভাসটেটিং, ভয়ঙ্কর। পুরো রিজার্ভয়ের অর্থাৎ দু'শো তেপ্পান্ন বর্গমাইলের এতদিনকার জমা পানি একসাথে বেরোবার চেষ্টা করছে—কল্পনা করুন একবার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মি. রাজলু, এই তোড়ের মুখে প্রেসিডেন্টের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাক্‌-চীন প্যাক্ট নিয়েও ভারতকে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না।'

'আমাকে আপনি আশ্চর্য করে দিচ্ছেন, মি. চৌধুরী। ভয়ানক নিষ্ঠুর লোক আপনি, মশাই। এত সাঙ্ঘাতিক একটা কাজ এমন ঠাণ্ডা মাথায় কি করে করছেন আপনি? এতটুকু বিকার নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে একবারও কি দ্বিধা হচ্ছে না, কিংবা হচ্ছে না একবিন্দু বিবেক-দংশন?'

'দেখুন, সে অনেক কথা। আমাদের কারও হাতেই অত সময় নেই যে এ নিয়ে আলাপ করব। তবু এটুকু আপনাকে বলতে পারি যে এমন হঠাৎ করে যদি প্রয়োজন হয়ে না পড়ত তাহলে হয়তো এত প্রাণ নষ্ট না করে অন্য উপায় অবলম্বন করতাম আমি। কেবল মাত্র আকস্মিক প্রয়োজনের তাগিদেই আপনাদের সাহায্য নিতে হচ্ছে আমাকে—এবং কেবলমাত্র এই জন্যেই প্রজেক্ট ওপেনিং-এর দিন ড্যাম ভাঙার গর্হিত প্রস্তাব আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হলো।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে বাঁকা পাইপটায় টোবাকো ভরা হচ্ছিল, এবার সেটা ধরিয়ে নিয়ে টেলিভিশন সেটের একটা নব সামান্য ঘুরিয়ে ছবিটা আরও পরিষ্কার করে দিল মি. চৌধুরী। তারপরই কী দেখে চমকে উঠে 'এক্সকিউজ মি,' বলে একপাশে টেবিলের উপর রাখা ওয়্যারলেস্‌ ট্রান্সমিটারের সামনে গিয়ে বসল।

হঠাৎ চৌধুরীকে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে বিস্মিত গোবিন্দ রাজলু টেলিভিশনের দিকে চেয়ে দেখল তাতে একজন মার্কিন সাহেবকে দেখা যাচ্ছে। হাত নেড়ে কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে সে—বাঁধের কাছেই জলের মধ্যে কিছু লক্ষ করছে সাহেব টর্চ জ্বেলে।

কানে এয়ার ফোন লাগিয়ে ইলেভেন মেগাসাইকেল্সে সিগন্যাল দিল চৌধুরী।

'এক্স ওয়াই জেড কলিং এস বি টু, ক্যান ইউ হিয়ার মি?' দু'বার কথাটা বলল চৌধুরী।

'এস বি টু স্পীকিং। হিয়ার ইউ লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার।' সাথে সাথেই উত্তর এল স্পীড-বোট থেকে।

'তেরো নম্বরকে বোটে ফিরিয়ে আনো—সিগন্যাল দাও।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর উত্তর এল, 'আমাদের সিগন্যাল পাচ্ছে না তেরো নম্বর—অনেক দূর চলে গেছে। এগিয়ে যাব সামনে?'

একমুহূর্ত চিন্তা করে চৌধুরী বলল, 'না, ফিরে চলে এসো এক্ষুণি।'

চিন্তিত মুখে আবার কী-বোর্ডে কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে বলল, 'এক্স ওয়াই জেড কলিং কে পি ফাইভ, এক্স ওয়াই জেড···এক্স ওয়াই জেড···এক্স ওয়াই জেড। ক্যান ইউ হিয়ার মি?' বার কয়েক কথাটা উচ্চারণ করল সে। তারপর উত্তর এল।

'দিস ইজ কে পি ফাইভ। হিয়ার ইউ লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার, স্যার।' কাপ্তাই ভি আই পি রেস্ট হাউসের একটা কামরায় ট্রান্সমিটারের সামনে বসে শুনছে কে পি ফাইভ।

'ড্যামের গায়ে আননাকি থারটিন কাজ করছে, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ধরা পড়বে ও। তুমি গিয়ে পানিতে নামবে সবার আগে। যন্ত্রপাতি মাটি চাপা দিয়ে দেবে, এবং তেরো নম্বরের মৃতদেহ নিয়ে ওপরে উঠবে। বুঝতে পেরেছ? তেরো যেন জ্যান্ত পানির ওপর না ওঠে।'

'বুঝেছি, স্যার, যাচ্ছি এখুনি।'

সিক্সটি মডেলের একটা কালো শেভ্রোলে চীফ এঞ্জিনিয়ার লারসেনের পাশে এসে থামল জোরে ব্রেক কষে। জানালা দিয়ে মুখটা বের করে আরোহী বলল, 'হ্যালো, লারসেন, কি করছ এখানে?'

'হাল্লো, ইসলাম। তুমি কোত্থেকে? নেমে এসো, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।'

'কি ব্যাপার?' বলে গাড়ি থেকে নেমে এল রাফিকুল ইসলাম। অফিসার্স ক্লাবের হিরো এই ইসলাম। ক্লাবে মোটা স্টেকে ব্রিজ, ফ্ল্যাশ, পোকার খেলে এবং প্রতিবার প্রচুর টাকা হেরে, প্রচুর পরিমাণে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে সে সবার কাছে। বছর তিনেকের নিয়মিত যাতায়াতে সবার সাথেই খাতির জমিয়ে নিয়েছে এই সদালাপী সুদর্শন ধনী যুবক। লারসেন সাহেবও একে খুব স্নেহের চোখে দেখেন।

'ওই দেখো। ওখানে বুদ্বুদ কিসের বলতে পারো?'

টর্চের আলোয় পানির উপর অনেকগুলো বুদ্বুদ দেখল ইসলাম। বলল, 'আশ্চর্য!

এ তো অ্যাকুয়া লাঙ-এর ভুড়ভুড়ি। ওখানে কাউকে নামিয়েছে নাকি নিচে?'

'না। ওই টিলার কাছ থেকে কেউ পানির নিচ দিয়ে এসেছে বাঁধের গায়ে। লোকটা কি করছে জানা দরকার।'

'কাল গিয়েছিলাম কক্সবাজারের সী-তে রেয়ার কিছু শঙ্খ তুলতে। গাড়ির পেছনে অ্যাকুয়া-লাঙটা বোধহয় রয়ে গেছে। নেমে দেখব নাকি?'

'দাঁড়াও, আবদুলকে স্টোরে পাঠিয়েছি—ও আসুক, দু'জন একসাথে নেমো। পানির নিচে একাধিক লোক থাকতে পারে, অস্ত্রশস্ত্রও থাকতে পারে।'

হেসে উড়িয়ে দিল ইসলাম কথাটা। তারপর গাড়ির পিছন থেকে কম্প্রেস্‌ড এয়ারের সিলিণ্ডার ফিট করা কিম্ভূতকিমাকার ডুবুরী-পোশাক বের করে পরে নিল আধমিনিটের মধ্যে। কাঁটাতারের বেড়া টেনে ধরলেন মি. লারসেন, বাঁধের গায়ে সাজিয়ে রাখা বড় বড় কালো পাথরগুলোর উপর পা ফেলে ফেলে তরতর করে নেমে গেল ইসলাম পানিতে।

কিছুদূর নেমেই কাঁচের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল প্রায় সত্তর-আশি ফুট নিচে একটা উজ্জ্বল আণ্ডারওয়াটার টর্চ জেলে কি যেন করছে আন্‌লাকি থারটিন। আন্‌লাকিই বটে! হাসল ইসলাম।

প্রায় পনেরো ফুট কাছে যেতেও যখন লোকটা টের পেল না তখন পকেট থেকে সরু একটা টর্চ বের করল ইসলাম। ওর ভয় কেবল লোকটার পাশে মাটিতে রাখা হার্পুন বন্দুকটাকে।

আর তিন হাত এগোতেই হঠাৎ তেরো নম্বর কাজ বন্ধ করল, তারপর চট করে ঘুরে ইসলামের দিকে টর্চের আলো ফেলেই একটানে হার্পুনটা তুলে নিল হাতে। টর্চের তীব্র আলো পড়ায় মস্তবড় একটা কাতলা মাছ সড়াৎ করে সরে গেল সামনে দিয়ে।

সাথে সাথেই হাতের পেন্সিল-টর্চ জেলে সিগন্যাল দিল ইসলাম। হার্পুনের ট্রিগার থেকে আঙুলটা সরে গেল তেরো নম্বরের। প্রত্যুত্তরে সেও সিগন্যাল দিয়ে হার্পুনের সেফটি-ক্যাচটা আবার তুলে দিল উপরে। তারপর সেটা নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসে পড়ল মাটিতে। এতক্ষণ একটানা পরিশ্রমে রাবারের ভিতরে দর দর করে ঘাম ঝরছে ওর দেহ থেকে। ভাবল, বোধহয় তার কাজ তদারক করবার জন্যে এল কেউ। কিন্তু কেন জানি বুকের ভিতরটা একবার কেঁপে উঠল ওর।

বরফে গর্ত করবার একটা ফিন-বোর দিয়ে বাঁধের গায়ে গর্ত খুঁড়ছে তেরো নম্বর। ফিন্‌ল্যাণ্ডে এই যন্ত্রের ব্যবহার খুব বেশি। হাতে তুলে নিয়ে দেখল ইসলাম প্রায় সাড়ে তিন ফুট লম্বা আর পানির নিচে সের দু'য়েক ওজনের এই যন্ত্র অনায়াসে বারো ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত তৈরি করতে পারে মাটিতে। মিনিয়াপোলিসের রাপালা কোম্পানীর তৈরি এই ফিন-বোর। ইচ্ছে করলে অনেক লম্বা করা যায় একে রড জুড়ে জুড়ে।

বন্দুকটা হাতে তুলে নিল ইসলাম। দেখল ফ্রান্সের নাম করা 'চ্যাম্পিয়ান' হার্পুন গান ওটা। সমুদ্রে হাঙ্গর, ব্যারাকুডা, এমনকি তিমি মাছ পর্যন্ত মারতে এ জিনিস অদ্বিতীয়।

আবার কাজ করবার ইঙ্গিত করতেই আন্‌লাকি থারটিন যন্ত্রটা নিয়ে ঝুঁকে পড়ল

গর্তের উপর। আর ওর অজান্তে ইসলামের ডান হাতে ধরা সিরিঞ্জের সূচটা ঢুকে গেল রাবারের পোশাক ভেদ করে ওর পিঠে, হার্টের কাছটায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ে গেল লোকটা, ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল এক মুহূর্তে।

এবার গর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিল ইসলাম যন্ত্রটা এবং তার সাথের রডগুলো। তারপর মুখটা মাটি দিয়ে চেপে বন্ধ করে দিল।

উজ্জ্বল আলোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক মাছ দেখতে পেল সে। যেন একটা মস্তবড় অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে চলে এসেছে ও। ছোট ছোট মাছ নির্ভয়ে ওর পাশ দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। বড় বড় গলদা চিংড়ীর উপর আলো পড়তেই আট হাত-পা কুঁকড়ে ওগুলো কয়েক পা পিছিয়ে যাচ্ছে লেজের উপর ভর করে—টুকটুকে লাল চোখ দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে ওকে। অসংখ্য কাঁকড়া গর্ত থেকে অর্ধেকটা শরীর বের করে ওর মতি-গতি লক্ষ করছে—এগোলেই সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়বে গর্তে। টর্চের আলো দেখে কৌতূহলী বড় বড় রুই কাতলা ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে আশপাশে ঘুরঘুর করছে।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার তাগিদ অনুভব করল ইসলাম। অনায়াসে গোটা আষ্টেক মাছ মারল সে হার্পুন দিয়ে। তারপর একটা সরু শক্ত দড়ি দিয়ে মাছগুলোকে বেঁধে নিয়ে তেরো নম্বরের মাথার ঢাকনিটা খুলে আলগা করে দিল।

একহাতে হার্পুন আর মাছের দড়িটা আর অন্য হাতে তেরো নম্বরের মৃতদেহটা ধরে এবার টেনে নিয়ে চলল সে উপরে। মাঝপথে আসতেই দেখা গেল আবদুল নামছে নিচে। আবদুলের হাতে মৃতদেহটার ভার দিয়ে আগে আগে উপরে উঠে এল ইসলাম।

বাঁধের উপর এখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কয়েকজন গার্ডও এসে গেছে। একজন গেছে থানা থেকে ও.সি-কে ডাকতে। রীতিমত হুলস্থুল কাণ্ড।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপরে উঠে এল ইসলাম। মাথা থেকে ঢাকনিটা খুলতেই লারসেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটা কোথায়? মাছ কিসের?'

'আবদুল আনছে লোকটাকে। ব্যাটা হার্পুন দিয়ে আমাকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল। নেমে দেখি ভদ্রলোক বাঁধের গায়ে বসে বসে মাছ মারছেন।'

'আই সী! তাহলে মাছ চুরি হচ্ছে রিজারভয়ের থেকে এই কায়দায়। আমি ভেবেছিলাম, না জানি কী। তুমি জখম হওনি তো?'

'না বেকায়দায় পড়ে পা-টা শুধু মচকে গেছে। ভেঙেও গিয়ে থাকতে পারে। এক্ষুণি হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

এমন সময় আবদুল উঠল লোকটাকে নিয়ে। সবাই ধরাধরি করে কাঁটাতারের এপাশে নিয়ে এল দেহটা। আবদুলের চোখে চোখ পড়তেই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল রাফিকুল ইসলাম।

এরপর আর্টিফিশিয়াল রেস্‌পিরেশনের চেষ্টা—কিভাবে ধস্তাধস্তিতে লোকটার মাথার ঢাকনি খুলে গেছে তার মনগড়া বিবরণ—পুলিসের ডায়েরী—হাসপাতাল পাঠানো—পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা।

কালো শেভ্রোলের বিলীয়মান ব্যাক লাইট দুটোর দিকে চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে আবদুল বলল, 'শুয়ার কা বাচ্চা!'

দুই

টেবিলের উপর পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে ব্রেকফাস্ট।

এক গ্লাস অ্যাপল্ জ্যুস কয়েক ঢোকে শেষ করে ঠক করে টেবিলের উপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের উজ্জ্বলতম তারকা শ্রীমান মাসুদ রানা—বয়স ছাব্বিশ, উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, গায়ের রঙ শ্যামলা, সে বাংলায় কথা বলে।

সকাল আটটা। দশটার দিকে অফিসে একবার নিয়মিত হাজিরা দিয়ে আজ যাবে ক্লাবের স্যুইমিং পুলে—দু'টি মেয়েকে কথা দিয়েছে সাঁতার শেখাবে। দশটার এখনও অনেক দেরি। তাই ধীরে সুস্থে দুটো কাঁচা পাউরুটি আর দুটো মচমচে টোস্টের উপর এক আঙুল পুরু করে চিটাগাং-এর ডিটা মাখন লাগিয়ে নিল রানা। পরিজ আর সেই সাথে দুধের বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিল ডান ধারে, খাবে না। তারপর একটা কাঁচা রুটির উপর কোয়েটা থেকে আনানো হান্টারস বিফ কেটে স্লাইস করে সাজিয়ে এক কামড় দিল। সেই সাথে এক প্লেট ভর্তি স্ক্র্যাম্বল্‌ড্ এগ থেকে এক এক টেবল-স্পূনফুল অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল। বিফ শেষ হতেই আরেকটা স্লাইসের উপর সাজানো হলো ক্রাফট্ পনির। মিনিট খানেকের মধ্যে সেটাও যখন শেষ হয়ে এল তখন মচমচে টোস্টের উপর হালকা করে মিচেলসের গুয়াভা জেলি লাগানো হলো—সেই সঙ্গে চলল গোটা দুই ইয়া বড় মুন্সিগঞ্জের অমৃতসাগর কলা। তারপর ফ্রিজ থেকে সদ্য বের করা বোতলের ঠাণ্ডা পানি ঢেলে নিল রানা একটা গ্লাসে। তিন ঢোকে গ্লাসটা শেষ করতেই ঘরে ঢুকল রাঙার মা।

বুড়িকে এক নজর দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করে সোফায় হেলান দিয়ে জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিল রানা টেবিলের উপর। চোখ বন্ধ করেই সে অনুভব করল, ফরসা টেবিল ক্লথের উপর রাখা জুতো জোড়ার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বুড়ি পট থেকে কফি ঢেলে রানার হাতের কাছে টি-পয়ের উপর রাখল, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরপর দু'কাপ কড়া কফি খেয়েও গতরাত জাগরণের গ্লানিটা শরীর থেকে গেল না মাসুদ রানার। ক'দিন ধরে কাজ নেই হাতে। আজ টেনিস; কাল গলফ, পরশু স্যুইমিং, তার পরদিন রোয়িং, ফ্লাইং, ডান্সিং, ব্রিজ ইত্যাদি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত ছটফট করছে তার বিপদ আর রোমাঞ্চ প্রিয় মনটা। গত রাতে তিনটে পর্যন্ত পোকার খেলেছে ক্লাবে— কিন্তু এসবে কি আর মন ভরে?

একা মানুষ। ৫/১-বি পুরানা পল্টনে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি ভাড়া করে আছে সে। তিনখানা বড় বড় ঘর। লাইট, কল, অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ, কিচেন, সার্ভেন্টস কোয়ার্টার, সব ব্যবস্থা ভাল। গাড়ি বারান্দার সামনে ছোটখাট বেশ সুন্দর একটা লন আছে। ভাড়া পাঁচশো টাকা। অফিস থেকেই ভাড়া পায় বাড়িওয়ালা মাসে মাসে। ধনীর দুলাল সেজে থাকতে হয় রানাকে অফিসের হুকুমেই।

ঘর তিনখানার একখানা রানার বেডরুম, একটা ড্রইংরুম; বাকিটা খালি পড়ে থাকে হঠাৎ যদি কোন অতিথি এসে পড়ে, সেই অপেক্ষায়।

মোখলেস বাবুর্চির হাতে ইংলিশ খানা খাচ্ছিল এতদিন, হঠাৎ বছর দু'য়েক আগে একদিন রাঙার মা এসে উপস্থিত হলো। জিজ্ঞেস করল, 'ও আব্বা, রান্নার নোক নাগবি?'

প্রথম দর্শনেই রানার পছন্দ হয়ে গেল বুড়িকে। বয়স পঞ্চান্নর উপর, দাঁত একটাও নেই। এ বয়সেও শরীর একেবারে ঢিলে হয়ে যায়নি—আঁট-সাঁট কর্মঠ চেহারা। আর আসল কথা হলো, কেন জানি রানার নিজের মরা মায়ের কথা মনে পড়ল ওকে দেখে। কোথায় যেন মিল আছে। বলল, 'ভাল রান্না করতে জানো?'

'জানি।' কথাটার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আছে।

'আগে কোথায় কাজ করেছ?'

'ওমা! নোকের বাসায় কাজ করতি যাব কেন? আমার নিজিরই···' হঠাৎ চেপে গেল বুড়ি। তারপর একটু মলিন হাসি হেসে বলল, 'বিটার বউয়ের সাথি নাগ করে আসছি।'

'বাড়ি কোথায় তোমার?'

'যশোহর।'

'ছেলে-বউ কোথায়?'

'সিখানেই।'

'ও, পালিয়ে এসেছ ঢাকায়? দু'দিন পর আবার মন টানলেই এখান থেকে পালাবে। যাও তুমি, এমন লোক আমার লাগবে না।'

এই উত্তরই যেন আশা করেছিল, ঠিক এমন ভাবে কোন রকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করেই চলে যাচ্ছিল বুড়ি। হঠাৎ রানা কি ভেবে ডাকল পিছন থেকে। বুড়ি ঘুরতেই দেখল জল গড়াচ্ছে ওর চোখ দিয়ে। বুঝল রানা, এক কাপড়ে রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে—ঢাকায় কোথাও কিছু চেনে না—এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঠোকর খেয়ে ফিরছে, কিন্তু চাকরি হয়নি। খাওয়াদাওয়া হয়নি ক'দিন কে জানে। এমন অপ্রত্যাশিত দুর্বিপাকে পড়ে রাগে দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়েছে বুড়ি। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কাছে এসে দাঁড়াতেই রানা বলল, 'তা বেতন চাও কত?'

'আমি তো জানিনে, কাজের নোককে সবাই যা দেয় তাই দেবেন।'

'বেশ। থাকো আমার এখানেই। মোখলেস তো ওর হাঁড়ি-পাতিল ধরতে দেবে না। তুমি এখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও, বিকেলে ওর সাথে গিয়ে দোকান থেকে সব কিনে আনবে।'

সেই বুড়ি রয়েই গেল। ঝোঁকের মাথায় ওকে থাকতে বলেই খুব আফসোস হয়েছিল রানার—কেন শুধু শুধু জঞ্জাল বাড়াতে গেলাম? বেশ তো চলছিল, কোন হাঙ্গামা ছিল না। ভেবেছিল—কোন ছুতো পেলেই বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু পরদিন ওর হাতের বাঙালী রান্না খেয়ে পরিতৃপ্তির একটা ঢেকুর তুলে রানা ভাবল—ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক একে রাখতেই হবে, ছাড়া যাবে না।

এখন অবশ্য বাজার করা ছাড়া মোখলেসের অন্য কাজ নেই—অল্পদিনেই বুড়ি বিলিতী রান্নাতেও ওকে ছাড়িয়ে গেছে, আর মোখলেসও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'হ্যালো, ফাইভ-এইট-টু-সেভেন,' রানা ধরল।

'কে, মাসুদ সাহেব বলছেন?' প্রশ্ন এল অপর দিক থেকে।

'হ্যাঁ। কি খবর, সারওয়ার?'

'আপনাকে একটু অফিসে আসতে হবে, স্যার। বড় সাহেব জরুরী তলব করেছেন আপনাকে।' মেজর জেনারেল রাহাত খানের পি. এ. গোলাম সারওয়ার বলল নির্বিকার কণ্ঠে।

বিশেষ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উপস্থিত হলে চেহারা-চালচলনে একটা নির্লিপ্ত ভাব চেষ্টাকৃত ভাবে এনে এক ধরনের আনন্দ পায় গোলাম সারওয়ার। বোধহয় আত্মসংযমের আনন্দ। রানার খুব ভাল করে জানা আছে এ কণ্ঠস্বর। তাই জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি বলো তো, সারওয়ার! নতুন গোলমাল বাধল কিছু?'

'কোথায় আছেন, স্যার! হুলুস্থুল কারবার। ভোর পাঁচটা থেকে অফিস করছি আজ। জলদি চলে আসেন।' বলেই ফোন ছেড়ে দিল কাজের চাপে সর্বক্ষণ ব্যস্ত অক্লান্ত পরিশ্রমী গোলাম সারওয়ার অন্য কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়েই।

মাসুদ রানা চোখ বন্ধ করে স্পষ্ট দেখতে পেল টেলিফোনটা রেখেই চটপট গোটা কতক 'ইমিডিয়েট' লেবেল লাগানো ফাইল নিয়ে গোলাম সারওয়ার ছুটল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কামরার দিকে।

ঘন কালো ভুরু জোড়া অল্প একটু উঁচু করে ছোট্ট একটা শিস দিল মাসুদ রানা। তাহলে তো খেলা জমে উঠেছে মনে হচ্ছে!

প্যান্ট আর জুতো পরাই ছিল—ভোরবেলা গোসল করেই সে এগুলো পরে ফেলে সব সময়। ড্রয়ার থেকে পিস্তল ভরা হোলস্টারটা বের করে বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা। পিস্তলটা খুব দ্রুত কয়েকবার হোলস্টার থেকে বের করে ঠিক জায়গা মত হাতটা পড়ছে কিনা দেখে নিল। তারপর রোজকার অভ্যাস মত স্লাইডটা আটবার টেনে একে একে আটটা গুলি বের করে পরীক্ষা করল ইজেক্টার ক্লিপটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা। ম্যাগাজিন রিলিজটা টিপতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল খালি ম্যাগাজিন। আবার স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা বুলেট ঢুকিয়ে আস্তে হ্যামারটা নামিয়ে দিল রানা। সব সময় ঠিক ফায়ারিং পজিশনে এনে রাখে সে তার বিপদসঙ্কুল রোমাঞ্চকর জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত সাথী এই পয়েন্ট থ্রী-টু ক্যালিবারের ডাবল অ্যাকশন অটোমেটিক ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তলটি। ম্যাগাজিনে সাতটা বুলেট ভরে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিল রানা। ক্যাচের সাথে আটকে একটা ক্লিক শব্দ হতেই সন্তুষ্ট চিত্তে আবার শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখল সে তার ছোট্ট যন্ত্রটা। তারপর একটা নীল টি-শার্ট পরে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ভাল করে দেখে নিল শোল্ডার হোলস্টারটা কোন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে স্টার্ট দিল ওর একান্ত প্রিয় জাগুয়ার এক্স কে ই গাড়িতে।

'ও আম্মা, দরোজার চাবিটা নেছেন?' রাঙার মা এসে দাঁড়াল।

'না তো, কেন? তুমি বাসায় থাকবে না?'

'দোফরে একটু মীরপুরের মাজার যাব।'

'ড্রয়ার থেকে আমার চাবিটা নিয়ে মোখলেসের কাছে দিয়ে যেয়ো।'

'ও-ও তো আমার সঙ্গে যাবি।'

'বেশ, তোমার চাবিটা জলদি আমাকে দাও—তুমি ড্রয়ার থেকে আমারটা নিয়ে নিয়ো। নাও, তাড়াতাড়ি করো।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু হাসল রানা। যেদিনই বিশেষ টেলিফোন আসবে অফিস থেকে, সেদিনই বুড়ির মীরপুরের মাজারে যাওয়া চাই। এই দুই বছরের মধ্যে রাঙার মা দেখেছে, যতবারই এমন টেলিফোন এসেছে ততবারই আব্বা কয়দিন আর বাড়িতে ফেরেনি। প্রায়ই শরীরে কাটাকুটি নিয়ে বাড়ি ফেরে আব্বা। একবার তো বিশদিন পর খাটিয়ায় করে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে দিয়ে গেল কয়েকজন লোক—সারা অঙ্গে জখমের দাগ। একমাস কত সেবা-শুশ্রূষা করে জ্যান্ত করতে হয়েছে তাকে। আব্বা যে কি কাজ করে তা ঠিক জানে না সে, তবে কাজটা যে খুবই ভয়ঙ্কর আর বিপদজনক তা সে বুঝতে পারে। সদাসর্বদা তাই শঙ্কিত হয়ে থাকে সে। একেক বার মনে হয় আব্বা বোধহয় পুলিসের লোক; আবার সন্দেহ হয়, পুলিসের লোক যদি হয় তবে মেজাজ এত ঠাণ্ডা কেন? গোলাগুলির সাথে কারবার আব্বার—ওই তো আব্বার সাথে সব সময় ছোট-বন্দুক থাকে। এইটাই আব্বার চাকরি, বিপদ আছে বলেই না মাসে মাসে ষোলোশো টাকা করে মাইনে দেয় আব্বাকে। কোন ভাবে বারণ করতে পারে না সে, তাই যতবারই রানা কোন কাজে হাত দেয়, ততবারই রাঙার মা মীরপুরের মাজারে গিয়ে মানত করে আসে। যখন সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় সে ফিরে আসে, তখন মোখলেসকে দিয়ে মানত পুরো করে দেয়। বিরক্ত হয়ে মোখলেস একদিন রাঙার মার এসব গোপন কথা বলে দিয়েছে রানাকে।

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার একটা সাততলা বাড়ির পিছন দিকটায় গাড়ি পার্ক করে লিফটের বোতাম টিপল মাসুদ রানা। ওকে দেখে লিফ্‌টম্যান কোন প্রশ্ন না করেই ফিফ্‌থ্‌ ফ্লোর, অর্থাৎ ছ' তলায় উঠে এল। ছয় এবং সাততলার সবটা জুড়ে পি.সি.আই. বা পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অফিস। নিচের তলাগুলো হরেক রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টুকরো টুকরো করে ভাড়া নিয়ে দফতর খুলেছে।

ছ'তলার বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছে রেকর্ড সেকশনের ব্যস্ত-সমস্ত কেরানীর দল, জনা পনেরো মেয়ে-পুরুষ টাইপিস্ট, স্টেনো ইত্যাদিতে। কেবল ডানধারের সব শেষে করিডরের দু'পাশে মুখোমুখি চারটে কামরায় বসে রানা আর তার তিন সহকর্মী।

সাত তলার এক অংশে মেজর জেনারেল রাহাত খান আর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখের কামরা। আর বাকিটায় অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত ওয়্যারলেস সেকশন। সাড়ে তিনশো কিলোওয়াটের অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রান্সমিটার রয়েছে ছাতের উপর। বিদঘুটে সব যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ডায়াল করছে স্পেশাল ট্রেনিংপ্রাপ্ত জনাকয়েক অপারেটর, কানে হেডফোন। মাইক্রো ওয়েভ, সানস্পট আর হেভি সাইড লেয়ারের জগতে আছে এরা। পাশের টেবিলে রাখা শর্টহ্যাণ্ড খাতা, ডিক্টাফোন।

সব মিলিয়ে নিখুঁত এ প্রতিষ্ঠানটি। কোন গোলমাল নেই; যেন আপনাআপনি সব

কাজ হয়ে যাচ্ছে, এমন শৃঙ্খলা।

মাসুদ রানা প্রথমে ঢুকল নিজের কামরায়। ঘরটার চারভাগের একভাগ কার্ড-বোর্ডের পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা। সেখানে টাইপিস্ট মকবুল বসে রানার গত কেসটার পূর্ণ বিবরণ টাইপ করছে। রানাকে দেখে পিঠটা কুঁজো করে উঠে দাঁড়াতে গেল মকবুল। 'বোসো,' বলে সুইং ডোর ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকল রানা।

ইন লেখা বেতের কারুকাজ করা ট্রে-তে গোটা কয়েক ফাইল জমা হয়ে আছে। ওগুলোর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাসল রানা। ভাবল আজ বাছাধনেরা একটু বিশ্রাম নাও, আজ আর তোমাদের কাছে ভিড়ছি না।

টেবিলের উপর হাতের ডানধারে রাখা ইন্টারকমের একটা বোতাম টিপে রানা বলল, 'মাসুদ রানা বলছি, আমাকে ডেকেছিলেন, স্যার?'

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এল, 'ওপরে এসো।'

বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল খানিকটা রক্ত। কেমন একটা আনন্দশিহরণের মত অনুভব করল রানা এক সেকেণ্ডের জন্যে। মাসখানেক পর আজ আবার গিয়ে দাঁড়াবে সেই তীক্ষ্ণ দুটো চোখের সামনে—যে চোখকে আজ সাত বছর ধরে সে ভক্তি করেছে আর ভালবেসেছে। ওই ক্ষুরধার দৃষ্টির ইঙ্গিতে কতবার কত ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে বিনা দ্বিধায়।

লিফটের দিকে না গিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল রানা। সুন্দরী রিসেপশনিস্ট মিষ্টি করে হাসল একটু। রানাও হেসে দ্রুততর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ডানধারে সবশেষের ঘরটায় বসেন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল রাহাত খান। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের এত উপরে উঠতে পেরেছিলেন। ১৯৫২ সালে শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তান যখন বহির্বিশ্বের ক্রমবর্ধমান কুচক্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে, ঠিক সেই সময় অবসর গ্রহণ করলেন আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খান। সাথে সাথেই নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলো, নাম দেওয়া হলো পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স—এবং দ্বিধামাত্র না করে রাহাত খানকে বসিয়ে দেয়া হলো এর মাথায়। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর ঢাকায় এর হেড-কোয়ার্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হলো।

নিজহাতে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন রাহাত খান মনের মত করে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে কয়েক বছরের মধ্যে এত বেশি সুনাম অর্জন করেছে এ প্রতিষ্ঠান যে আমেরিকা, ব্রিটেন আর সোভিয়েট ইউনিয়নের গুপ্তচর বিভাগ এখন পি.সি.আই.-কে নিজেদের সমকক্ষ বলে স্বীকার করতে গর্ব অনুভব করে।

কিছুটা গোপনীয়তার খাতিরে আর কিছুটা পাকিস্তানের বাইরে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কার্যরত পি.সি.আই. এজেন্টদের জরুরী খবর আদান-প্রদানের সুবিধার জন্যে বাড়িটা ভাড়া নেয়া হয়েছে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ছদ্মনামে। মস্ত বড় সাইন বোর্ড টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে ইংরেজিতে লেখা:

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন
এক্সপোর্টার্স-ইমপোর্টার্স-ইনডেনটার্স

ব্যবসার খাতিরে বা চাকরির খোঁজে কেউ যদি ভুল করে এখানে এসে ওঠে, তবে রিসেপশনিস্টের মিষ্টি হাসি এবং কয়েকটা প্রশ্নের না-বাচক উত্তর নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরতে হয়।

'আসুন, স্যার। বড় সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল গোলাম সারওয়ার। টেলিফোন করবার ঠিক চার মিনিটের মধ্যে রানাকে সশরীরে উপস্থিত দেখে একটু বিস্মিতই হলো সে। তারপর আবার মগ্ন হয়ে গেল আপন কাজে।

আস্তে দরজাটা খুলে ঘরে প্রবেশ করল রানা। পুরু কার্পেটে আগাগোড়া মোড়া মস্ত ঘরটা। উত্তর দিকের জানালার দামী কার্টেনটা একপাশে সরানো। পুরু বেলজিয়াম কাঁচে ঢাকা মস্তবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে রিভলভিং চেয়ারে আরাম করে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে কি যেন ভাবছেন রাহাত খান। হাতে কিং সাইজের একটা জ্বলন্ত চেস্টারফিল্ড সিগারেট। আমেরিকান টোস্টেড টোবাকোর গন্ধ সারা ঘরে।

দরজাটা খুট করে বন্ধ হতেই চোখ ফিরিয়ে একবার আপাদমস্তক দেখলেন রানাকে, তারপর টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন রাহাত খান। মাথাটা একটু ডান দিকে ঝাঁকিয়ে আবছা ইঙ্গিতে বসতে বললেন রানাকে।

এসব ইঙ্গিত রানার মুখস্থ—বিনা বাক্যব্যয়ে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। এবার তাঁর আটান্নতম জন্মবার্ষিকীতে রানার উপহার দেয়া রনসন গ্যাস লাইটারের তলায় চাপা দেয়া একটা চারভাঁজ করা কাগজ তুলে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'এটায় একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দাও। মজার জিনিস।'

ভাঁজ খুলে দেখল রানা, ক্রীম কালারের অনিয়নস্কিন পেপারে ইংরেজিতে টাইপ করা একটা চিঠি ওটা। সাইজ ৮·৫×১১ ইঞ্চি, অর্থাৎ ডিমাইয়ের চারভাগের একভাগ। বেশ কিছুদূর গড়গড় করে পড়ে গেল সে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা চিঠিটা। হঠাৎ চিঠিটার উপর দিকে ডান ধারে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখেই রানা বুঝল এটা ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের চিঠি। এই চিহ্ন আগেও দেখেছে সে কয়েকবার।

মুখ তুলে রাহাত খানের দিকে চাইতে তিনি ইঙ্গিত করলেন ওটা পকেটে রেখে দেবার জন্যে। বেশি কথা বলা পছন্দ করেন না তিনি, তাই যতটা সম্ভব ইঙ্গিতেই কাজ সারেন।

এবার আর একটা কাগজ টেবিলের উপর রানার দিকে একটু ঠেলে দিলেন তিনি। বললেন, 'ওই চিঠির অনুবাদ। মন দিয়ে পড়ো। কোথাও বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করবে।'

রানা একবার জেনারেলের মুখের দিকে চাইল। কিছুই আন্দাজ করা গেল না সে মুখ দেখে। গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। কপালে আর গালে বয়সের ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। কাঁচা-পাকা ভুরু। এছাড়া ঋজু দেহটায় প্রৌঢ়ত্বের আর কোন চিহ্ন নেই। ইজিপ্শিয়ান কটনের ধবধবে সাদা স্টিফ-কলার শার্ট, সার্জের স্যুট আর ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা দামী টাইয়ের নট—সবটা মিলিয়ে খুব সপ্রতিভ চেহারা বুড়োর। তীক্ষ্ণ চোখ দুটো এখন নিরাসক্তভাবে চেয়ে আছে সামনের দেয়ালে

টাঙানো অ্যাংলো-সুইস ঘড়িটার দিকে।

একটু ঝুঁকে চিঠিটা তুলে নিল রানা টেবিলের উপর থেকে। ইংরেজিতে লেখা সে-চিঠির বাংলা করলে দাঁড়ায়:

মঙ্গলবার

'এল' সেন্টারে তোমার কাজ প্রশংসা অর্জন করেছে। নতুন কাজের ভার দেয়া হচ্ছে। তোমার ফোক্সওয়াগেন নিয়ে আগামীকাল, বুধবার ঠিক এগারোটায় ডি-সি ফেরী পার হও। ১৬৫ মাইল পথ, গড়পরতা ৪০ মাইল বেগে চলবে। বেলা তিনটা পঁয়তাল্লিশে চারজন ই. পি. আর. সেপাই তোমার গাড়ি থামিয়ে চারটে প্যাকেট তুলে দেবে গাড়ির সামনের বুটে। সেই সাথে গাড়িতে উঠবে একজন মহিলা। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দশ নম্বর রূম বুক করা আছে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট হোটেলে। সেখানে লাগেজ উঠিয়ে প্যাকেটসুদ্ধ গাড়িটা মেয়েটির হাতে ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করবে হোটেলেই।

দু'বার আগাগোড়া চিঠিটা পড়ে মুখ তুলল মাসুদ রানা। দেখল দুটো চোখ গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করছে তাকে।

'কি বুঝলে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, স্যার! ভারতীয় কোন গুপ্তচরকে গাড়ি চালিয়ে ঢাকা থেকে চিটাগাং যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আজই, এগারোটার সময়।' চট করে রিস্টওয়াচটা দেখে নিয়ে আবার রানা বলল, 'সুপরিকল্পিত কোন প্ল্যান বলেই মনে হচ্ছে। পৌনে চারটেয় কুমিল্লা ছাড়িয়ে চৌদ্দগ্রামের কাছাকাছি বর্ডারের পাশ দিয়ে যখন গাড়ি যাবে, তখন ই.পি.আর-এর ছদ্মবেশে কয়েকজন ভারতীয় সেনা গাড়িতে কিছু মাল তুলে দেবে। চিটাগাং-এ কোন সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে, স্যার। নিরাপত্তার জন্যে কাজটা দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে—ছেলেটার কিছুটা, মেয়েটার কিছুটা।'

রানার মধ্যে এই হঠাৎ উত্তেজনার সঞ্চার দেখে একটু হাসলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বললেন, 'ঠিক ধরেছ। এখন শোনো। এই সাঙ্কেতিক চিঠিটা নিতান্ত ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেছে ভারতের এক নামকরা গুপ্তচর সুবীর সেনের পকেটে। গতরাতে আড়াইটার দিকে শাহবাগ হোটেল থেকে মাতাল অবস্থায় ফিরছিল সে গাড়ি চালিয়ে। ঢাকা ক্লাবের সামনে একটা শাল গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেছে সে গাড়ি।'

রানার মনে পড়ে গেল, গত রাতে ক্লাব থেকে ফেরার পথে একটা সাদা ফোক্সওয়াগেনকে প্রায় চুরমার অবস্থায় দেখেছে সে ঢাকা ক্লাবের সামনে। বলে ফেলল, 'গাড়িটা আমি দেখেছি, স্যার।'

ভুরু কুঁচকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে রাহাত খান বললেন, 'তোর

সোয়া-পাঁচটায় মিলিটারি ক্রেন এসে উঠিয়ে নিয়ে গেছে সে গাড়ি। রাত অ.ড়াইটা থেকে ভোর সোয়া পাঁচটা—এর মধ্যে তুমি দেখলে কি করে সে গাড়ি? লম্পট সুবীর সেনের মত তুমিও নিশ্চয়ই ফিরছিলে কোনওখান থেকে, রানা?'

চুপ করে থাকল রানা। গতরাতের অনাচারের কথা কঠোর নীতিপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ রাহাত খানের কাছে গোপন থাকল না।

'নিজেকে শুধু শুধু অপচয় কোরো না, রানা,' রানার অপরাধী মুখের দিকে চেয়ে বললেন খান। দুই সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'যাক, যা বলছিলাম, চিঠিটা সে পেয়েছে খুব সম্ভব পাক এয়ার-লাইন্সের কোন এয়ার হোস্টেসের কাছ থেকে। কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে এই দু'মুখো সাপ (যে সমস্ত পাকিস্তানী ভারতের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাদেরকে খান সাহেব ঘৃণা ভরে দু'মুখো সাপ বলেন) কলকাতা থেকে এ চিঠি নিয়ে এসেছে এবং রাতে সেনকে পৌঁছে দিয়েছে।'

আরেকটা সিগারেট ধরাবার জন্যে থামলেন রাহাত খান। সেই ফাঁকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিটা আমাদের হাতে এল কি করে, স্যার?'

চোখে ধোঁয়া যাওয়ায় চোখ দুটো পেঁচিয়ে উপর দিকে ঘুরিয়ে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ডাক্তার ওর পকেট থেকে এ চিঠি পেয়ে পুলিসকে দিয়েছে। পুলিস কোড ব্রেক করতে না পেরে ভোর সাড়ে চারটায় আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আমাদের কোড এক্সপার্ট আধ ঘণ্টায় কোড ব্রেক করে আমার কাছে জরুরী টেলিফোন করেছে। এগুলো রুটিন ওয়ার্ক। এখন তোমার কাজটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। শোনো, সুবীর সেন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়; এয়ার হোস্টেসকে চিনে বের করা আমাদের বিশ মিনিটের কাজ; ই.পি.আর-এর ছদ্মবেশে ভারতীয় সৈন্যদের এবং সেই মহিলা গুপ্তচরকে আমরা অনায়াসে মালসহ গ্রেপ্তার করতে পারি। এসব কাজ মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এগুলো করলে আসল সূত্রটা যাবে হারিয়ে। আমি জানতে চাই ভারতের এই সব তৎপরতার আসল উদ্দেশ্য কি—গোড়াটা কোথায়। প্যাকেটে করে কি জিনিস চালান হচ্ছে; যাচ্ছে কার কাছে, এবং কেন। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এবার বেশ পরিষ্কার হয়ে এল আসলে তার কাজটা কি।

'আজই বুধবার। এখন ঘড়িতে ন'টা বাজতে পাঁচ।' এবার একটু চাঞ্চল্যের রেশ পাওয়া গেল রাহাত খানের কণ্ঠে। 'ঠিক এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ ফেরিঘাটে পৌঁছতে হবে তোমাকে সুবীর সেনের ভূমিকায়। একটা সাদা ফোক্সওয়াগেনের সামনে-পিছনে সেনের গাড়ির নাম্বার লেখা হয়ে গেছে এতক্ষণে। দু'ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে সেটা নিয়ে তুমি রওনা হবে চিটাগাং-এর পথে।'

কথাটা বলে আধ-মিনিট খানেক সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখলেন রাহাত খান অন্যমনস্কভাবে। তারপর আবার বললেন, 'আসল সুবীর সেন যে আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে সে খবর সম্পূর্ণ চেপে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেনকে সোয়া পাঁচটার দিকে মেডিকেল কলেজ থেকে সরিয়ে আর্মি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর গাড়িটা মিলিটারি ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আগেই বলেছি। হোটেল ক্যাসেরিনায় টেলিফোন করে বলে দেয়া হয়েছে 'সেন সাহেব আমাদের বাসায় রাত কাটিয়েছেন; বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় কাল রাতে আর

হোটেলে ফিরতে পারেননি। আজ জরুরী কাজে চিটাগাং চলে যাচ্ছেন—দু'একদিন পর ফিরবেন', তাও আরও নিশ্চিত হবার জন্যে অ্যাংলো ম্যানেজার এ. ডি. কোস্টারকে ডেকে পাঠিয়েছি এখানে—একটু টিপে দিলেই সব পরিষ্কার বুঝবে ছোকরা। কাজেই সেনের দুর্ঘটনার খবরটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। বর্ডারের সৈন্যরা বা মেয়েটি টের পাচ্ছে না কিছুই, সাবধানও হতে পারছে না।'

'কিন্তু, স্যার, যে কোন একজন ওয়াচার কি যথেষ্ট ছিল না? আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন?' রানা আরেকটু পরিষ্কার করে জানতে চায় সব কথা।

'তার কারণ, চিঠিটা পড়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিরাট কোন পরিকল্পনার প্রায় সমাপ্তির দিকে চলে এসেছে ওরা। সুচিন্তিত, সুষ্ঠু আয়োজন দেখছি সবদিকে। তাই পাঠাচ্ছি তোমাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার জানতে হবে তোমার—কী আছে প্যাকেটে, কাকে দেয়া হচ্ছে সেটা, আর কেন দেয়া হচ্ছে। বুঝেছ?'

'জি, স্যার।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওদের সমস্ত কুমতলব বানচাল করে দিতে হবে আমাদের। তাই আমাদের সবচেয়ে, মানে, মোটামুটি একজন বুদ্ধিমান লোককে পাঠাতে হচ্ছে। এখন তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে বলো।'

রানা বলল, 'গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি, কিন্তু ঠিক কোন্ হোটেলে উঠতে হবে জানা নেই।'

'দাঁড়াও, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' ইন্টারকমের একটা বোতাম টিপে রাহাত খান বললেন, 'শেখ, কোন খবর পেলে?'

'জি, স্যার। আমি আসছি এখুনি।' ইন্টারকমের ভিতর দিয়ে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার কর্নেল শেখের গলাটা কেমন ধাতব খনখনে শোনাল।

লম্বা চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট থেকে একটা চিপ্টে যাওয়া সিগারেট বের করলেন রাহাত খান প্যাকেটের উপর টোকা দিয়ে দিয়ে। তারপর রনসন গ্যাস লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিলেন একটা দিক। কয়েক সেকেণ্ড 'ইন' ট্রের কয়েকটা জরুরী কাগজে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন রাহাত খান। তারপর রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'চিটাগাং-এর সব হোটেলেই টেলিফোন করা হয়েছে, দেখা যাক তোমার ভাগ্যে কোন হোটেল জুটল।'

কর্নেল শেখ ঘরে ঢুকবার সময় রাহাত খানের কথার শেষটুকু শুনে রানার দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'হোটেল মিসখা। চেনেন?'

'চিনি। স্টেশন রোডে, রেস্ট হাউসের ঠিক উল্টো দিকে, সিনেমা হলটার পাশে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। মিসখার পাঁচ তলায় দশ নম্বর এয়ার কণ্ডিশন্ড রুম বুক করা আছে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাসুদ রানা, থুরি, সুবীর সেনের নামে।' রানার পাশে একটা চেয়ারে সশব্দে বসল প্রকাণ্ড দেহী কর্নেল শেখ। যেমন উচ্চতা তেমনি প্রস্থ। ভদ্রলোক খাস মুলতানী। নিজ রসিকতায় নিজেই খুশি হয়ে ওঠেন।

'মিসখা এয়ার কণ্ডিশন করেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'না, স্যার, কোন কোন ঘরে এয়ার কুলার লাগিয়ে দিয়ে দশ টাকা চার্জ বেশি নেয়।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রানা,' কাজের কথায় এলেন আবার রাহাত খান, 'তোমরা পৌঁছবে সেখানে সন্ধে সোয়া সাতটার দিকে। মেয়েটা যখনই প্যাকেটগুলো পৌঁছাবার জন্যে নিচে নামবে লিফটে করে, তুমি সাথে সাথে নেমে আসবে সিঁড়ি বেয়ে। সামনের রাস্তাটা পার হয়েই দেখবে চালকবিহীন একটা নীল রঙের ওপেল রেকর্ড স্টার্ট দেয়া অবস্থায় রাখা আছে রাস্তার ওপর। ওই গাড়িতে করে পিছু নেবে মেয়েটির। এরপর কিভাবে এগোবে তা স্থির করার ভার তোমার উপরই থাকবে। চিটাগাং-ঢাকা ডিরেক্ট টেলিফোন লাইন থাকায় তোমার সাথে আর ওয়্যারলেস সেট দিচ্ছি না। যখনই প্রয়োজন মনে করো তখনই রিং করবে।'

মাথা নেড়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, চোখের পাতা নামালেন এবং সেই সাথে তর্জনী দিয়ে সিগারেটের উপর লম্বালম্বিভাবে একটা টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়লেন রাহাত খান। তার মানে 'উঠো না, একটু বসো।' শেষ একটা টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে বোতাম টিপলেন রাহাত খান। উপরের পাতটা দু'ভাগ হয়ে ভিতরে চলে গেল টুকরোটা। 'ছ্যাঁৎ' করে একটা শব্দ হলো ভেতর থেকে, আর পাতলা এক ফালি ধোঁয়া বেরিয়ে এল কোনও এক ফাঁক দিয়ে।

'আর একটা কথা,' এতক্ষণ পর আন্তরিকতার একটা ক্ষীণ হাসির আভাস পাওয়া গেল রাহাত খানের মুখে, 'বলা যায় না, আমাদের অজ্ঞাত কোন উপায়ে অপরপক্ষ জেনে ফেলতে পারে যে তুমি সুবীর সেন নও। হয়তো এখনি সবকিছু জেনে গেছে ওরা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিপদের ঝুঁকিটা কতখানি বুঝতে পারছ? কাজেই খুব সাবধান থাকবে। আর সব রকম পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকবে। যাও এখন।'

কথাগুলো শোনাল, ছোটকালে বাইরে কোথাও পাঠালে মা যেমন বারবার করে বলে দিতেন, 'দেখিস, খোকা, গাড়ি ঘোড়া দেখে চলিস। আর রাস্তার ডানধার ঘেঁষে হাঁটবি, বুঝলি?' ঠিক তেমনি।

মৃদু হেসে রানা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হঠাৎ যদি সে পিছন ফিরত, তাহলে দেখতে পেত তার সুঠাম দীর্ঘ একহারা চেহারার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খান।

তিন

আই.ডাব্লিউ.টি.এ ফেরিটা দাউদকান্দি পৌঁছল দেড়টার সময়। তারপর একটানা পথ। মেঘবিহীন খর-বৈশাখের দুপুর। অসহ্য গরম বাতাস আগুনের হল্কার মত জ্বালা ধরায় চোখে-মুখে। এমন দিনে এত বেলায় শখ করে কেউ ঢাকা থেকে চিটাগাং যায় না। কেউ নিতান্ত ঠেকায় পড়লে ভোর বেলার ফেরীতে পার হয়ে দেড়টা দুটোর মধ্যে পৌঁছে যায় চিটাগাং। তাই মাসুদ রানার সহযাত্রী অন্য একটা গাড়িও নেই যে তার সাথে পাল্লা দিয়ে দূর পথ চলার একঘেয়েমি কাটাবে। মাঝে মাঝে কেবল এক আধটা বাস বা ট্রাক আসছে সামনে থেকে—একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে দাউদকান্দির দিকে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল এত কম যে মাঝে

মাঝে হঠাৎ ধোঁকা লাগে, এ কোথায় চলেছি! গাড়ির ভিতরের ভ্যাপসা গরমে মাথাটা ঘুরে উঠতে চায়।

কুমিল্লায় পৌঁছে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে পেট্রল নিয়ে নিল মাসুদ রানা। গাড়ি থামালেই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে রানার দৃঢ় দুই বাহুর লোমকূপগুলো ঘিরে, জুলফির ভিতর দিয়ে ঘাম গড়িয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করে, আর সুড়সুড়ি লাগে। আবার ষাট—পঁয়ষট্টি—সত্তর—আশিতে ওঠে স্পীড মিটারের কাঁটা চল্লিশ মাইলের গড়পড়তা ঠিক রাখতে। তখন নোনতা ঘামেভেজা শরীরটা শুকিয়ে চড়চড় করে।

ঝির ঝির এয়ার কুলড এঞ্জিনের একটানা একঘেয়ে শব্দ, আর গাড়ির নিচ দিয়ে কার্পেটের মত কালো পিচের রাস্তাটার অনবরত পিছনে সরে যাওয়া। মাঝে মাঝে এক আধটা শিরীষ কি অশ্বত্থ গাছ ঝাঁই করে চলে যাচ্ছে পিছনে। রাস্তার পাশে নিচু জায়গায় যেখানে অল্পস্বল্প পানি আছে, সেখানে এক-আধটা বক ধৈর্যের সাথে মাছের অপেক্ষায় বসা।

রানা ভাবছে, যদি আসল ঘটনা প্রতিপক্ষ জেনে গিয়ে থাকে তবে বসন্তপুর বা চোদ্দগ্রামে গিয়ে কি দেখবে সে। হয়তো ই.পি.আর এবং মেয়েটির কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না রাস্তায়। এমনও হতে পারে সেনকে বন্দী করার পাল্টা জবাব হিসেবে ওকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে সৈন্যরা। যা হবার তাই হবে—মাথা থেকে এসব বাজে চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করল রানা। খুব সম্ভব এত শিগগির ওরা টের পায়নি সুবীর সেনের ব্যাপার। কিন্তু নিজের অজান্তেই আবার ভাবতে লাগল সে, যদি সৈন্যরা কোন রকম সিগন্যাল বা কোডওয়ার্ড আশা করে ওর কাছ থেকে পরিচিতি হিসেবে, তখন কি করবে সে? তখনই তো হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে ও। সে দেখা যাবেখন। আবার চিন্তাটাকে দূর করে দিল রানা। কোড থাকলে জানাত চিঠিতে।

এবার পথের দিকে মন দিল সে। ভাগ্যিস চিটাগাং-ফেনি-কুমিল্লা-দাউদকান্দি বাস সার্ভিস রয়েছে; তাই মাঝে মাঝে 'পথের সাথী', 'গ্রীন অ্যারো', 'টাইগার এক্সপ্রেস' বা 'দুল দুল' লেখা এক আধটা বাসের দেখা পাওয়া যায়, আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রানা।

আচ্ছা, মেয়েটা দেখতে কেমন হতে পারে? স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একই ঘরে সীট রিজার্ভ করবার অর্থ কি? মেয়েটিকে চোখে চোখে রাখা?

হঠাৎ একটা লোহার রড বোঝাই ট্রাক সামনে থেকে এসে ঘাড়ের উপর উঠবার উপক্রম করল রানার। বেশ কিছুটা দূর থেকেই স্পীড কমিয়ে তিরিশে নিয়ে এসেছিল রানা, কিন্তু ভাবতেও পারেনি যে ট্রাক ড্রাইভারটা হারামীপনা করে সবটা রাস্তা জুড়ে ফুল স্পীডে আসবে—জায়গা ছাড়বে না একটুও। এক হেঁচকা টানে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে ঘাসের উপর নেমে এল রানা। ডান পা-টা এক্সিলারেটর ছেড়ে হাইড্রলিক ব্রেকের উপর তিনটে মৃদু চাপ দিল। গাড়িটা ততক্ষণে কয়েকটা ছোট-বড় গর্তে পড়ে পদ্মার ঢেউয়ের মাথায় ডিঙি নৌকোর মত নাচানাচি আরম্ভ করেছে। কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল গাড়ি। ট্রাক ততক্ষণে বহুদূর চলে গেছে। অসম্ভব রাগ হলো রানার। নির্জন রাস্তায় একা গাড়িতে বসে ট্রাক ড্রাইভারের উদ্দেশে অশ্রাব্য, অকথ্য ভাষায় গালাগালি বর্ষণ করল সে কিছুক্ষণ ইংরেজি-বাংলা-উর্দু মিশিয়ে।

তারপর সন্তুষ্টচিত্তে আবার স্টার্ট দিল গাড়িতে। চোদ্দগ্রাম ছাড়িয়ে গেল রানা, তবু কারও দেখা নেই।

ঠিক তিনটে সাতচল্লিশে রানা দেখল একটা ওয়্যারলেস ফিট করা উইলিজ জীপ আসছে দূর থেকে। একটু কাছে আসতেই আরোহীদের স্পষ্ট দেখা গেল। কয়েকজন খাকি পোশাক পরা লোক এবং একজন মহিলা বসে আছে গাড়িতে। এক মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নিল রানা। টীশার্টের উপরের দিকে দুটো বোতাম খোলাই ছিল—আরেকটা খুলে দিল সে, যাতে, প্রয়োজনের সময় পিস্তল বের করতে কোন অসুবিধে না হয়। বাম বাহু দিয়ে পাঁজরের সাথে চেপে স্প্রিং-লোডেড হোলস্টারটার স্পর্শ অনুভব করল সে একবার। গজ পনেরো থাকতেই নাম্বার প্লেট দেখে ব্রেক কষল জীপটা। ড্রাইভার হাত বের করে রানাকে থামবার ইঙ্গিত করল। রানাও ব্রেক করে ঠিক জীপের পাশে থামাল ওর গাড়ি।

রানাকে দেখেই মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, 'নমস্কার, সুবীর বাবু।'

'নমস্কার।' সদ্য ফোটা শিশির মাখা ফুলের মত প্রাণবন্ত এবং সুন্দরী মেয়েটির দিকে এক মুহূর্ত অবাক চোখে চেয়ে উত্তর দিল রানা।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে মেয়েটির। কপালে কুমকুমের লাল টিপ। ঠোঁটে হালকা গোলাপী লিপস্টিক। বড় করে একটা বিড়ে খোঁপা বেঁধেছে মাথায়—তাতে সুন্দর করে প্লাস্টিকের ক'টা রজনীগন্ধা গোঁজা। সরু চেনের সাথে বড় একটা লাল রুবি বসানো লকেট ঝুলছে বুকের উপর। ডান হাতে এক গাছি সোনার চুড়ি, বাঁ হাতে ছোট্ট একটা রোলগোল্ডের সাইমা ঘড়ি। ফরসা গায়ের রঙ তার আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে। একহারা লম্বা গড়ন অটুট স্বাস্থ্যের লাবণ্যে কমনীয়। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে ঝাঁঝাল লাল আর হলুদে মেশানো কাতান শাড়িটায়। সত্যিই এমন চেহারা সহজে চোখে পড়ে না।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করল রানা। জীপের ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এসে রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করল আর্মি অফিসার। বলল, 'দিস্ ইজ ক্যাপ্টেন মোহন রাও। হাউ ডু ইয়ু ডু, মি. সেন?'

'হাউ ডু ইয়ু ডু,' স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সাথেই উত্তর দিল রানা।

'কয় প্যাকেট লাগবে আপনার, মি. সেন?' প্রশ্ন করল মোহন রাও।

'চারটে।'

'বেশ, গাড়ির পেছনের সীটে তুলে দিচ্ছি প্যাকেটগুলো।'

'না। সামনের বুটে রাখতে বলুন।'

ব্যস, আর প্রয়োজন হলো না। এটুকুতেই বুঝে নিল ক্যাপ্টেন যা বুঝবার। জোরে রানার হাতটা আবার বার কয়েক ঝাঁকিয়ে দিল।

ততক্ষণে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। একটু মিষ্টি গন্ধ। মৃদু রিনিঠিনি চুড়ির শব্দ। আঁচল উড়ছে বাতাসে।

'বাব্বা, কী অসম্ভব গরম!'

'আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন না।' যেন কতকালের চেনা, এমনিভাবে বলল রানা। মেয়েটির দ্বারা এই মুহূর্তে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই—লক্ষ রাখতে হবে

সিপাই তিনজন আর ক্যাপ্টেনটার দিকে।

গাড়িতে গিয়ে বসল মেয়েটা। তারপর বাঁ হাতে লিভার টান দিয়ে সামনের বনেটটা খুলে দিল। ফোক্সওয়াগেন গাড়ি সম্বন্ধে মেয়েটির পরিষ্কার ধারণা আছে বোঝা গেল।

হিন্দীতে জীপের লোকগুলোকে কিছু বলল ক্যাপ্টেন। সশব্দে লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে ই.পি.আর.-এর ইউনিফরম পরা তিনজন সেপাই। বাঙালী বলে মনে হলো না। বোধহয় দাড়ি কামানো শিখ হবে। বিনা বাক্যব্যয়ে জুতোর বাক্সের চাইতে সামান্য বড় তিনটে প্যাকেট খুব যত্নের সঙ্গে এনে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল সেপাইরা বুটের মধ্যে। বাক্সগুলো পাতলা কেরোসিন কাঠের। বাইরে থেকে স্টীলের পাত দিয়ে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধা। দু'একটা খড়কুটো বেরিয়ে আছে প্যাকেটের গায়ের কোন ফাঁক দিয়ে। গায়ে লেবেল বা কোন রকম চিহ্ন নেই। ভিতরে কি আছে ঠিক বুঝতে পারল না রানা, কিন্তু বয়ে আনার ধরন দেখে মনে হলো ছোট হলেও প্যাকেটগুলো অত্যন্ত ভারি। একজন ফিরে গিয়ে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট প্যাকেট এনে রাখল বুটের ভিতর, তারপর বনেটটা নামিয়ে দিতেই অটোমেটিক লক হয়ে গেল সেটা।

বাকি দু'জন ততক্ষণে মেয়েটির একটা সুটকেস তুলে দিয়েছে গাড়ির পিছনের সীটে। এদের মনে কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক হয়নি দেখে আশ্বস্ত হলো রানা। পি.সি. আই.-এর নিপুণ কাজের জন্যে গর্ব অনুভব করল সে।

হঠাৎ পিছন থেকে খটাশ করে জোরে একটা আওয়াজ হতেই চমকে ফিরে দাঁড়াল রানা। দেখল তিনজন একসাথে বুট ঠুকে স্যালিয়্যুট করছে ওকে। রানার ডান হাতটা দ্রুত চলে এসেছিল পিস্তলের কাছে—এক সেকেণ্ডে সামলে নিয়ে ও-ও হাত তুলে ভারতীয় কায়দায় প্রত্যাভিবাদন করল। পর মুহূর্তেই এক লাফে জীপের পিছনে উঠে বসল তিন সেপাই ঠিক তিনটে বানরের মত, এবং সাথে সাথে সাঁ করে চলে গেল জীপটা যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই।

বিলীয়মান গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল রানা। দিন দুপুরে ভোজবাজির মতই ঘটে গেল যেন ঘটনাগুলো। এই কয়মিনিট আগে গ্রীষ্মের প্রখর রোদের মধ্যে উত্তপ্ত রাস্তার উপর সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একা গাড়ি চালাচ্ছিল সে। হঠাৎ কোথাকার এক জীপ এসে তার সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার নিরসন করে অজানা অচেনা এক রাজকন্যেকে তুলে দিয়ে গেল রানার হাতে, যেন যাদুমন্ত্রের বলে। এখন আর সে জীপের কোন চিহ্নও নেই—রয়েছে কেবল সে, আর মেয়েটি।

'হাঁ করে কী দেখছেন, সুবীর বাবু! এদিকে গরমে যে ঘেমে নেয়ে উঠলাম,' জড়তাহীন পরিষ্কার সুরেলা গলা।

গাড়িতে ঢুকেই আবার সুগন্ধ পেল রানা। শ্যানেল নাম্বার ফাইভ সেন্টের মিষ্টি গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে গাড়ির ভিতরটা।

'সিগারেট খেলে অসুবিধে হবে আপনার?'

'মোটেই না।'

'যাক, বাঁচা গেল,' বলে রানা স্টার্ট দিল গাড়িতে। গাড়ি ছুটছে পঁচাত্তর মাইল বেগে। আগের কথার খেই ধরে বলল, 'বিয়ের আগে সব মেয়েই এ রকম বলে।'

কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলেই তাদের মতামত পাল্টে যায়। স্বামীর নেশা ছাড়াবার জন্যে তখন উঠে পড়ে লেগে যায় তারা।'

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে রানা বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড, আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও।'

'সুলতা রায়।'

'ক'বছর আছেন সার্ভিসে?'

'দেড় বছর। এতদিন ফাইল নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করেছি। এই প্রথম আমার বাইরে আসা। কপালটা ভাল, প্রথমেই আপনার সাথে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।'

'কপাল ভাল, তার মানে?' মনে মনে হাসল রানা। কপালটা তোমার খারাপ, সুন্দরী!

'ভাল বলব না? সুবীর সেনের সাথে কাজ করবার সুযোগ ক'জনের হয়? সার্ভিসের অন্যান্য মেয়েরা তো হিংসায় মরে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা? এতই বিখ্যাত লোক আমি?' মৃদু হাসল রানা। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

'কই, সিগারেট ধরাচ্ছেন না যে?' হঠাৎ বলল সুলতা।

'খাই না।' হাসল রানা। 'ও-কথা বলে গল্প শুরু করলাম আর কি।'

কথায় কথায় মেয়েটি বলল কেমন ভাবে সাধারণ ডিউটি থেকে তাকে সরিয়ে সাতদিন স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, তারপর কলকাতা থেকে বর্ডারে আনা হয়েছে হেলিকপ্টারে করে। সেখান থেকে কত বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে বর্ডার ক্রস করেছে জীপটা ভয়ে ভয়ে। এখন অন্য পথে ফিরে যাবে আবার সেটা ভারতীয় এলাকায়।

ফেনীতে এসে সুলতা বলল তেষ্টা পেয়েছে। দু'জন দুটো ডাবের পানি খেয়ে নিয়ে আবার রওনা হলো। এরই মধ্যে আরও সহজ ও সাবলীল হয়ে এসেছে সুলতা রায়। মাসুদ রানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর অতীতের কথা, বাবা-মার কথা, ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞেস করে করে শুনল মন দিয়ে। সুলতাও মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে যার-পর- নাই উৎসাহিত হয়ে ওর নিজস্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বলে গেল অনেক কথা। পথের ক্লান্তি ভুলে গেল দু'জন।

বাবা ছিলেন উকিল,ছেলেবেলায় লাক্ষ্ণৌ শহরে মানুষ, ক্যালকাটা লেডি ব্রাবোর্ন থেকে গ্র্যাজুয়েশন, তারপর সিক্রেট সার্ভিসে যোগদান।

মেয়েটার মস্ত বড় গুণ হচ্ছে দু'চার মিনিটে সবার সাথে বন্ধুত্ব করে নিতে পারে। নিজের কোন কথাই চেপে রাখবার চেষ্টা করল না ও। ওর জীবনের অনেক গোপন কথাও সে বলল রানাকে। বলতে বলতে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ থেকে। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে একটু থেমে আবার বলল, 'কেন যে এসব বলছি জানি না—ভাল করে চিনিও না আপনাকে—কিন্তু বড় ভাল লাগছে নিজের সব কথা আপনাকে বলতে। মনে হচ্ছে আমার সব কথা আপনি বুঝবেন, আপনাকে দিয়ে আমার কোন ক্ষতি হতে পারে না।'

মেয়েটার কথাবার্তার ধরন অনেকটা পুরুষের মত। চালচলনেও কিছুটা

পুরুষালী ভাব। মেয়েলীপনা বা ন্যাকামীর লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে। ওকে ভাল লাগল রানার।

একটা ব্রিজের কাছে আসতেই দেখা গেল দুটো বাঁশ পুঁতে একখানা সাইনবোর্ড টাঙানো:

বিদায়। নোয়াখালী জিলার শেষ সীমা।

বেশ বড় ব্রিজ। নিচ দিয়ে নদী গেছে একটা। ফেনী নদী। গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে সে নদী। পুলটা পার হতে এক টাকা শুল্ক দিতে হলো। অপর পারে আরেকটা সাইনবোর্ডে লেখা:

স্বাগতম। চিটাগাং জিলার শুরু।

হাতের বাঁ ধারে অল্প কিছু দূর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে মাটির টিলা সেই যে আরম্ভ হয়েছে, আর শেষ হতে চাইছে না কিছুতে। প্রায়ই ছোট ছোট বাজার-গঞ্জ পড়তে লাগল পথে। কাজেই গতি অনেক কমে গেল গাড়ির। সবচাইতে অসুবিধা করল বাঁশ বোঝাই গরু বা মোষের গাড়িগুলো। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে ওগুলো। দূর থেকে হর্ন বাজালে নড়ে না রাস্তার উপর থেকে। যখন কাছে যাওয়া যায় তখন হঠাৎ করে গাড়ি ঘুরিয়ে বাম ধারের অসমতল কাঁচা রাস্তার উপর নেমে পড়ে। ফলে পিছনের লম্বা বাঁশগুলো রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে চলে এসে সমস্ত পথটা বন্ধ করে দেয়। কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়িগুলো আবার পাকা রাস্তার সাথে সমান্তরাল না হওয়া পর্যন্ত অচল অবস্থায় ড্রাইভিং সীটে বসে মনে মনে মোষের গুষ্টি উদ্ধার করা ছাড়া উপায় নেই।

'কই, আপনি যে কিছুই বলছেন না? আমিই কেবল বক বক করে যাচ্ছি।' নিজের কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করল সুলতা।

'আমি অত সুন্দর করে বলতে পারি না,' এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল রানা।

জোরে হেসে উঠে কথাটা উড়িয়ে দিল সুলতা। একটা মাইল-পোস্ট পার হয়ে যাচ্ছিল, চট করে দেখে নিয়ে সুলতা বলল, 'চিটাগাং টেন মাইলস।'

তখন গোধূলি লগ্ন। সারাদিন পৃথিবীর উপর অগ্নিবর্ষণ করে সূর্যটা বঙ্গোপসাগরে ডুব দিয়ে গা-টা জুড়োচ্ছে এখন। পশ্চিম দিগন্তে এক আধ ফালি সাদা মেঘ এখন লাল। তারই হালকা আলো এসে পড়েছে সুলতার মুখের উপর। রূপকথার রাজকন্যার মত সুন্দর লাগছে ওকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল রানা ওর মুখের দিকে। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ইঁটের উপর হোঁচট খেলো গাড়িটা। ফিক করে হেসে সুলতা বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট করবেন নাকি?'

'যদি করি,তবে দোষ তোমার,' উত্তর দিল রানা।

রানার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা কথাটা কেমন যেন থমকে দিল সুলতাকে। কথাটা নিয়ে নিজের মনেই নাড়াচাড়া করল সে কয়েক মুহূর্ত। এত ভাল লাগল কেন কথাটা?

'আপনি—'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সুলতা, ওকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'আর "আপনি" নয়, এবার "তুমি"। চিটাগাং আর সাত মাইল। এখন থেকে আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, বুঝলে?'

হাসল সুলতা। 'আমি তো নকল স্ত্রী, তোমার আসল স্ত্রী জানতে পারলে মারবে তোমাকে। তাই না?'

'বিয়েই হয়নি, তার আবার আসল স্ত্রী!'

'ওমা, এত বয়স হয়েছে বিয়ে করোনি কেন? কাউকে ভালবাসো বুঝি?'

'নাহ্। ওসব বালাই নেই।'

'বাবা-মা নেই বুঝি তোমার?'

'না।'

'আমারও নেই। থাকলে এভাবে বখে যেতে পারতাম না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সুলতা। খসে পড়া আঁচল তুলে দিল বাঁ কাঁধে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—হেড লাইট জ্বেলে দিল রানা।

প্রায় দু'বছর পর চিটাগাং-এ এসে বেশ আশ্চর্য লাগল রানার। শহরের ভোলটাই যেন পাল্টে গেছে। উন্নয়নের কাজটা যেন ঢাকার চাইতেও অনেক বেশি দ্রুত হয়েছে এখানে। হরেক রকম অট্টালিকা ঝলমলে দোকান-পাট। রাস্তায় সারি সারি ফ্লোরেসেন্ট বাতি দিন করে রেখেছে রাতকে। পথঘাট বেশ পরিষ্কার মনে ছিল রানার, কাজেই স্টেশন রোডে মিসখা হোটেল চিনে বের করতে কোনও অসুবিধে হলো না।

হোটেলের সামনে ফুটপাথের ধারে এমন বেকায়দা করে গাড়ি রাখল রানা, যাতে খুব পাকা ড্রাইভারেরও কমপক্ষে দুই মিনিট সময় লাগে ওটাকে বাগে এনে রাস্তায় চালু করতে।

গাড়ি থামতেই হোটেলের পোর্টার দৌড়ে এল। সুলতা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ফুটপাথে। ওর সীটটা ভাঁজ করে ইঙ্গিত করতেই পিছনের সীটে রাখা রানা এবং সুলতার সুটকেস দুটো বের করল পোর্টার। গাড়ির কাঁচ তুলে দিয়ে দরজাটা লক করে চাবিটা দিল রানা সুলতার হাতে।

নিচতলার গেট দিয়ে ঢুকেই করিডরের বাঁ ধারে লিফট। বুড়ো লিফটম্যানের থুতনি থেকে ঝুলছে অল্প একটু পাকা ছাগলা-দাড়ি। সালাম করল সে রানাকে দেখে। পোর্টারকে পাঁচতলার দশ নম্বর রুমে মাল নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে লিফটে উঠল রানা আর সুলতা।

দোতলায় ম্যানেজারের কাউন্টার। সামনে মস্ত বড় লাউঞ্জে ফাঁক ফাঁক করে রাখা টেবিলগুলোর ওপর প্লেট, কাঁটা চামচ, ছুরি ইত্যাদি ডিনারের সরঞ্জাম পরিপাটি করে সাজানো। গ্লাসের মধ্যে সদ্য লণ্ড্রির ধোয়া ইস্তিরি করা ন্যাপকিন ফুলের তোড়ার মত কায়দা করে রাখা। কোন কোন টেবিল ঘিরে দু'জন-চারজন লোক বসা। বেশির ভাগই খালি।

অল্পবয়সী ম্যানেজার ওদের দেখেই এগিয়ে এল।

'এখানে আর আপনাদের দাঁড়াতে হবে না, স্যার। এই যে নিন আপনাদের ঘরের চাবি—পাঁচতলার দশ নম্বর রুম। আমি এন্ট্রি-বইটা পাঠিয়ে দেব ওপরে, সই করে দেবেন।'

'ধন্যবাদ। আমাদের ঘরের ওয়েটার কে?'

'হাসান আলী। ওকে দিয়েই বইটা পাঠাচ্ছি, স্যার।'

পাঁচতলায় উঠে এল ওরা। দেখল সুটকেস দুটো নিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পোর্টার।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই রানা এয়ার কুলারের হাই কুল লেখা সাদা বোতামটা টিপে দিল। মালগুলো ঘরে এনে রাখতেই পাঁচ টাকার একটা নোট বকশিশ দিয়ে দিল রানা পোর্টারকে। আশাতিরিক্ত বকশিশ পেয়ে সালাম ঠুকে বেরিয়ে গেল সে। প্রায় সাথে সাথেই একজন ঝাড়ুদারের সঙ্গে একহাতে একটা বই আর অন্য হাতে কিছু পরিষ্কার বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড় নিয়ে ঘরে ঢুকল হাসান আলী।

একটা আই সি আই ফ্লিট স্প্রে-গান দিয়ে সারা ঘরে, বিশেষ করে বিছানার তলে, টেবিলের নিচে আর আলমারির পিছনে স্প্রে করল জমাদার, তারপর ভিম-এর কৌটো নিয়ে অ্যাটাচড় বাথরুমে ঢুকল কমোড, বাথ-টাব আর বেসিনটা পরিষ্কার করবার জন্যে। হাসান আলী নিপুণ হাতে পুরানো বেড শীট আর বালিশের ওয়াড় সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিল ঘরটাকে দুই মিনিটের মধ্যে। এসব কাজগুলো এরা সবসময় নতুন 'কাস্টোমারের' সামনে করে—আগে থেকে করে রাখলে অনেক সময় আবার ডবল করে করতে হয়, তাই।

সুলতা বলল, 'একটু জল খাওয়াতে পারো? ঠাণ্ডা?'

'এক্ষুণি নিয়ে আসছি।' হাসান আলী ছুটল পানি আনতে।

বড়-সড় ঘরটায় পাশাপাশি দুটো সিঙ্গেল খাট—ইচ্ছে করলে জোড়া দিয়ে নেয়া যায়। কোণে একটা সাধারণ চম্বল কাঠের আলমারি। একটা মাঝারি গোছের ডাইনিং টেবিলের দু'পাশে দুটো চেয়ার রাখা। একটা ড্রেসিং টেবিল আর একটা ইজি চেয়ার। এই হচ্ছে ঘরের আসবাব।

রানাকে রিস্ট ওয়াচটা খুলে ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখতে দেখে সুটকেস থেকে কিছু কাপড় বের করতে করতে সুলতা বলল, 'আমি কিন্তু আগে যাচ্ছি বাথরুমে। সারাদিনের এই ধকলের পর এক্ষুণি চান করতে না পারলে মরে যাব।'

'মেয়েমানুষ, একবার বাথরুমে ঢুকলে তো আর বেরোতে চাইবে না সহজে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমিই আগে যাও—আমি পরে যাব। অলওয়েজ লেডিজ ফার্স্ট।'

হাসান আলী দু'হাতে দু'বোতল ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি নিয়ে ঢুকল। দুটো গ্লাস দিয়ে বোতলের মুখ ঢাকা। দশ টাকা বকশিশ পেয়ে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল হাসান আলীর।

'কিছু খাবে, সুলতা?' রানা প্রশ্ন করে।

'কেক-বিস্কিট গোছের কিছু আনতে বলো। আমি এক্ষুণি গা-টা ধুয়ে আসছি।' এক গ্লাস পানি খেয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সুলতা।

কয়েকটা কেক পেস্ট্রি আর দু'কাপ কফি আনতে বলল রানা। হাসান আলী চলে যাচ্ছিল, আবার ডাকল রানা। আরও একটা দশ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তোমার একটা কাজ করতে হবে, হাসান আলী, পারবে? টাকাটা রেখে দাও, বকশিশ।'

বিস্মিত হাসান আলী চট করে হাত উঠিয়ে সালাম করল দ্বিতীয়বার।

'খুব পারব, স্যার।' বিগলিত হাসান আলী এখন পা-ও চাটতে পারবে।

ইঙ্গিতে ওকে কাছে সরে আসতে বলে চাপা গলায় বলল রানা, 'গত রাতে হঠাৎ ওর (চোখদুটো তেরছা করে বাথরূমের দিকে ইঙ্গিত করল রানা) বাবা মারা গেছেন, খবর এসেছে। বাবার একমাত্র মেয়ে ও। খুবই আদরের মেয়ে। খবরটা ওকে জানানো হয়নি এখনও, বুঝলে? (মাথা ঝাঁকাল হাসান আলী) এখন খবরটা ওকে হঠাৎ করে জানাতে চাই না, ওর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, আচমকা আঘাত পেলে কি হয়ে যায় বলা যায় না। তাই না? (যেন খুব ব্যথা পেয়েছে, এমন মুখ করে সায় দিল হাসান আলী) সেজন্যে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার কিংবা ওর কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে ম্যানেজারের কাছ থেকে তুমি নিয়ে নেবে সেটা—নিয়ে গোপনে আমার হাতে দেবে, যেন ও ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। জিজ্ঞেস করলে বলবে কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম আসেনি। আর কেউ যদি ওর কাছে টেলিফোন করে বা দেখা করতে চায়, ও থাকুক বা না-ই থাকুক সোজা বলে দেবে বাবুর সাথে বাইরে গেছে। কি, পারবে না?'

'ঠিক আছে, স্যার, কোন চিঠিপত্র-টেলিফোন বা লোক এলে আমি সামলে নেব। কিন্তু উনি যদি কাউকে টেলিফোন করেন, তখন?'

'সে দিকটা আমি দেখব, তুমি কেবল এটুকু করলেই হবে। এখন যাও তো, চট করে কিছু খাবার নিয়ে এসো।'

ঠাণ্ডা ঘরটায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল রানা। সারাদিনের একটানা পরিশ্রমের পর এতক্ষণে চোখ দুটো একটু বিশ্রাম পেল। চোখের পাতায় অল্প অল্প জ্বালা অনুভব করল সে। দশ মিনিট এভাবে চুপচাপ পড়ে থাকল রানা। এতেই অনেকটা বিশ্রাম হয়ে গেল। তারপর চোখ মেলে দেখল উগ্র লাল রঙের একখানা বাটাউ প্রিন্ট শাড়ি সাদাসিধে একহারা করে গায়ে জড়িয়ে বাথরূম থেকে বেরোচ্ছে সুলতা।

চার

সুলতা লিফটে উঠতেই মাসুদ রানা ঘরে তালা দিয়ে তর তর করে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। রানা ভাবছিল, লিফটের ঠিক পাশেই সিঁড়ি ঘর, একই করিডর দিয়ে বেরোতে হয়, ওখান দিয়ে সুলতার পিছন পিছন বেরোলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

দোতলায় এসে ম্যানেজারের কাউন্টারে থামল সে। চাবিটা দিয়ে বলল, 'একটু বাইরে যাচ্ছি। আমাদের কোন চিঠি বা টেলিগ্রাম এলে হাসান আলীর হাতে দিয়ে দেবেন।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

'ফিরতে আমাদের রাত হতে পারে। গেট ক'টা পর্যন্ত খোলা রাখেন আপনারা?'

'গেটে তালা লাগিয়ে দেয়া হয় এগারোটায়। তবে এপাশ দিয়ে একটা পথ

আছে। দেরি হলে···'

'বেশ, বেশ,' উৎসাহিত হয়ে রানা বলল, 'কাউকে দিয়ে একটু চিনিয়ে দিন না পথটা—রাতে দরকার হতে পারে।'

'নিশ্চই, এই, সামাদ, যাও তো বাবুকে কিচেনের পাশের রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।'

সরু একটা গলি দিয়ে মেইন গেটটার গজ পনেরো বামে রাস্তায় এসে দাঁড়াল রানা। দেখল সুলতা ততক্ষণে গাড়িটা ঘুরিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছে।

হোটেলের সামনে রাস্তার অপর পারে নীল রঙের একটা ওপেল রেকর্ড দাঁড়িয়ে আছে। তিন লাফে রাস্তা পার হয়ে গাড়িতে উঠে বসল রানা। প্রায় একশো গজ দূরে ফোক্সওয়াগেনের টেইল লাইট দুটো দ্রুত সরে যাচ্ছে। রানার রিস্ট ওয়াচে এখন বাজে পৌনে ন'টা। রাস্তার ঝলমলে আলোর পাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদটাকে বড় ম্লান দেখাচ্ছে।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে মাইল তিনেক চলবার পর এল নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি। হাসপাতালের উল্টোদিকে আবগারী শুল্ক দফতরের পাশ দিয়ে গেছে বায়েজিত বোস্তামী বা ক্যান্টনমেন্ট রোড। প্রায় নির্জন রাস্তাটা দোহাজারী রেল লাইন পার হয়ে, মাজারের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ঠেকেছে গিয়ে চিটাগাং ক্যান্টনমেন্টে। বাঁ দিকে একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে রাঙামাটি রোডে।

অতদূর যেতে হলো না, রেল ক্রসিং আর মাজারের মাঝামাঝি জায়গায় এসে হঠাৎ ডানধারের একটা খোয়া-ঢালা কাঁচা রাস্তায় নেমে গেল সামনের ফোক্সওয়াগেন। বড় রাস্তার পাশে একটা একতলা বাড়ির উঁচু পাঁচিল—ঠিক তারপরই ডান দিক দিয়ে চলে গেছে কাঁচা রাস্তাটা।

ওপেলের নাকটা পাঁচিলের আড়াল থেকে একটু বেরোতেই ব্রেক করল রানা। প্রায় দেড়শো গজ দূরে হাতের বাম ধারে একটা দোতলা বাড়ির লোহার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল ফোক্সওয়াগেন। তারপর আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল গেট। গাড়িটা ব্যাক করে পাঁচিলের আড়ালে ঘুরিয়ে রেখে নেমে এল মাসুদ রানা।

দূর থেকে দেখা গেল উঁচু প্রাচীর দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। একতলার কয়েকটা ঘরে বাতি জ্বলছে, কিন্তু দোতলাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। চাঁদের আলোয় আবছা কতগুলো উঁচু টিলা দেখা গেল খানিকটা দূরে। একটা নিচু জমি আছে বাড়িটাতে পৌঁছবার আগে হাতের বাঁ ধারে। বোধহয় সেখানে বাড়ি তোলা হবে। মাটি ফেলে অর্ধেকটা ভরাট করা হয়েছে। কয়েক হাজার এক নম্বর ইঁট জায়গায় জায়গায় থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা।

বাড়িটার গেটের সামনেটা ডুম বাতির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। তাই বাঁ দিকে মাঠের মধ্যে নেমে গেল রানা। ইঁটের পাঁজার আড়ালে আড়ালে উঁচু প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। দেখল পাঁচিলের উপর আবার তিন ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। রানা বুঝল, অত্যন্ত সুরক্ষিত বাড়ি। একবার ভিতরে ঢুকে কোন ভাবে ধরা পড়লে ওখান থেকে আর বেরোতে হবে না। এমন জায়গায় একটা বাড়িকে এত সুরক্ষিত করার কি উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা গেল না।

প্রাচীর বরাবর কিছুদূর বাঁ দিকে চলে গেল রানা। ন'টা-সোয়া ন'টাতেই এই

এলাকা একেবারে নির্জন হয়ে গেছে। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। সেই সাথে থেকে থেকে নিচু জলা জায়গা থেকে বেসুরো ব্যাঙের ডাক। এক আধটা জোনাকী মিটমিট করছে ম্লান ভাবে।

গোটা কতক দশ ইঞ্চি ইঁট একটার উপর আরেকটা রেখে তার উপর উঠে দাঁড়াল রানা। আর হাত খানেক উপরে পাঁচিলের মাথা। লাফিয়ে উঠে পাঁচিল ধরল সে। কাঁটাতারের বেড়াটা প্রায় দেয়ালের গায়ে লাগানো। ওটাকে ঠেলে উঁচু করবার জন্যে যেই ধরেছে, অমনি ছিটকে দশ ফুট দেয়াল থেকে মাটিতে পড়ল রানা। অসম্ভব জোর এক ধাক্কায় মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি চলছে তারের মধ্যে দিয়ে। সেই বিদ্যুৎবাহী তারটা রানার ডান হাতের তালুতে আড়াআড়িভাবে বসে যাওয়ায় মাংস পোড়া গন্ধ ছুটল। ফোস্কা পড়ল না। দগদগে ঘায়ের মত কাঁচা মাংস দেখা যাচ্ছে। সাদা রস গড়িয়ে পড়ছে তার থেকে। অজ্ঞান হয়ে নিজের শরীরের ভারে মাটিতে পড়ে না গেলে কয়েক সেকেণ্ডেই মৃত্যু হত রানার।

দু'তিন মিনিট পর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। কানের কাছে তানপুরার মত একটানা ঝিঁঝি পোকার সুর আর কোলাব্যাঙের ক্লাসিকাল তান শুনে অবাক হলো সে। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে চোখে মুখে। ভাবল, এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দিই। ধীরে চোখ মেলল সে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখল একটা দেয়ালের গায়ে কয়েকটা মরচে ধরা সিক দেখা যাচ্ছে। মাটিতে ঘাসের উপর শুয়ে আছে ও। ভাবল, এ কোথায় আছি! হঠাৎ ডান হাতের তালুতে অসম্ভব জ্বালা করে উঠতেই সব কথা মনে পড়ে গেল ওর। উঠে বসে ক্ষত জায়গাটা একবার দেখল রানা। তারপর দেয়ালের উপর তারগুলোর দিকে চাইল একবার। ভাবল, আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল আমার। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। পকেট থেকে রুমাল বের করে ডান হাতটা পেঁচিয়ে নিয়ে সিকগুলোর দিকে ফিরল সে।

বাড়ির ভিতর থেকে একটা বড় নর্দমা এসে শেষ হয়েছে দেয়ালের বাইরে। ভিতর থেকে পানি এসে এই নিচু জমিতে পড়ে। মোটা সিক দিয়ে বেড়া দেয়া আছে নর্দমাটা। বহুদিনের পুরানো লোহা মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে। সেই নর্দমা দিয়ে হু-হু করে দখিনা বাতাস এসে রানার চোখে মুখে লাগছিল এতক্ষণ।

সিকগুলো সহজেই বাঁকিয়ে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব মনে করে হাত দিতে গিয়েও থমকে গেল রানা। যদি এতেও কারেন্ট থাকে! বোঝা যাবে কি করে? এবার আর ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা নেই—নিশ্চিত মৃত্যু!

'ম্যাও!'

চমকে উঠে দেখল রানা, বাড়ির ভিতর থেকে একটা বিড়াল এসে সিকের অপর পারে উঁকি দিচ্ছে। বাইরে চলাচল করবার এই সোজা পথ বের করে নিয়েছে সে। সিকের সাথে আলস্যভরে দু'বার গা ঘষে বাইরে বেরিয়ে এল বিড়ালটা। রানার দিকে নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চাইল একবার। তারপর পিঠের উপরটা দু'বার চেটে নিয়ে একটা বুক ডন দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল ডান ধারে।

নিঃসন্দেহ হয়ে এবার রানা বাঁ হাতে একটা সিক ধরে টান দিল। সিকগুলোর নিচের দিকটা একেবারে চিকন হয়ে গেছে মরচে ধরে গিয়ে, তাই বাঁ হাতেই

অনায়াসে বাঁকিয়ে উপর দিকে উঠিয়ে দিল সে। হাতের মুঠো থেকে একরাশ মরচে ধরা লোহার গুঁড়ো ঝরে পড়ল। খুশি মনে একটা একটা করে সবক'টা সিক বাঁকিয়ে তুলে দিল রানা উপর দিকে, তারপর ডানহাতে ওয়ালথারটা বাগিয়ে ধরে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বাড়িটার পিছন দিকে মস্ত বড় কম্পাউণ্ড। টিনের ছাউনি দেয়া লম্বা একখানা গুদাম ঘর দেখা গেল। তার সামনে পাঁচ টনের দুটো লরি দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফোর্ড, আরেকটা মার্সিডিজ। লোকজনের সাড়া শব্দ নেই। শেডবিহীন একখানা একশো পাওয়ারের বাল্‌ব-জ্বলছে গুদাম ঘরের এক কোণে বাইরের দিকে। নগ্ন দেখাচ্ছে ওটাকে। বনবন করে কয়েকটা পোকা ঘুরছে ওটার চারধারে।

গেটের দিকে কিছুদূর সরে এল রানা দেয়াল ঘেঁষে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সামনের বনেটটা হাঁ করা অবস্থায় ফোক্সওয়াগেনটা দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি বারান্দায়। রানার সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা। চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়েছে মাঠের ওপর। এই মুহূর্তে দ্বাদশীর চাঁদটাকে বড় বেশি উজ্জ্বল মনে হলো তার।

দ্রুত পদক্ষেপে একটা ছোট গাছের তলায় চলে এল রানা। সেখান থেকে বাড়ির পিছনটা আর মাত্র গজ দশেক দূরে। পিছন দিকে ব্যারাকের মত কয়েকটা চাকরের ঘর। কোন লোকজনের চিহ্ন দেখা গেল না ওদিকে। বাতি জ্বলছে না একটাও। কেবল একটা ইলেকট্রিক জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি আসছে সেদিক থেকে। নাহ্, কেউ লক্ষ করেনি ওকে।

মাথার উপর দিয়ে একটা বাদুড় ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল রানাকে সচকিত করে দিয়ে। আপন মনে ঝুলছিল গাছে, হঠাৎ কি মনে করে সশব্দে ডানা ঝাপটে চাঁদের আলোয় উড়তে লাগল ঘুরে ঘুরে।

বাড়ির পিছন দিকে দোতলার ব্যালকনিতে মাটি থেকে একটা মাধবী লতার ঝাড় উঠেছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে ঝাড়টা। মিষ্টি মধুর গন্ধ আসছে মৃদু বাতাসে।

গাড়ি বারান্দার সামনে সদর দরজা ছাড়া একতলায় ঢোকার আর কোন উপায় দেখতে পেল না রানা। জানালা দিয়েও কিছু দেখার উপায় নেই। কাঁচের সার্সীর ওপারে ভারি পর্দা ঝোলানো।

আবার কয়েক লাফে এগিয়ে এসে বাড়িটার গায়ে সেঁটে দাঁড়াল রানা। সতর্কভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পায়ের জুতো জোড়া খুলে ফেলল সে। তারপর পিস্তলটা হোলস্টারের মধ্যে পুরে তরতর করে দোতলার ব্যালকনিতে উঠে এল একটা পাইপ বেয়ে। রুমালের ভিতর ডান হাতের পোড়া তালুটা জ্বালা করে উঠল চাপ লেগে।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে পড়ল সাজানো গোছানো সৌখিন একটা শোবার ঘর। বিছানার উপর পরিপাটি করে দামী বেড কাভার পাতা। পেন্সিল টর্চ জেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খালি ঘরটা দেখল রানা। বোধহয় বেশ কিছুদিন হলো কেউ ব্যবহার করেনি এ ঘর। পাতলা এক পর্দা ধুলো জমেছে সব আসবাব-পত্রের উপর।

পরপর কয়েকটা ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রানা। ভূতুড়ে বাড়ির মত

শূন্য দোতলায় একটা লোকও নেই। সিঁড়ি ঘরের কাছে আসতেই দেয়ালের গায়ে একফালি আলো দেখা গেল। একতলার ভেন্টিলেটার থেকে আসছে আলোটা।

পায়ের পাতার উপর ভর করে নিঃশব্দে কয়েক ধাপ নেমে এল রানা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। ভেন্টিলেটারের ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে পেল ড্রইংরুমে একটা সোফায় বসে রানার দিকে মুখ করে কথা বলছে সুলতা, আর রানার দিকে পিছন ফিরে বসা দু'জন লোক অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনছে। সুলতা আর লোকগুলোর মাঝখানে একটা টেবিলের উপর সব ক'টা প্যাকেট রাখা। বড়গুলো থেকে একটা আর ছোট একটা প্যাকেট খুলে ভিতরের জিনিস সাজানো আছে টেবিলের উপর।

চৌকোণ ধাতব বস্তুটার উপর চোখ পড়তেই রানার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। ডিনামাইট! টি.এন.টি.! তাহলে তিনটে বাক্সের মধ্যে করে তিনটে ডিনামাইট এল ভারত থেকে গোপন পথে। সাথের ছোট বাক্সটায় এল একটা রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার। খুব সম্ভব ডিনামাইটগুলো ফাটানো হবে রেডিয়োর সাহায্যে।

সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রীভূত করে কান পেতে রানা শুনতে চেষ্টা করল সুলতার কথাগুলো। কিন্তু নিচু গলায় কথা হচ্ছে বলে কিছুই শোনা গেল না।

সামনে একজন কিছু জিজ্ঞেস করল। সুলতা ট্র্যান্সমিটারের কয়েকটা ডায়াল ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিল। রানা বুঝতে পারল বিশেষভাবে তৈরি এই রেডিয়ো-অপারেটেড ডিনামাইটের ব্যবহার পদ্ধতি বুঝিয়ে দিচ্ছে সুলতা। এ সম্বন্ধে কয়েকদিন বিশেষ ট্রেনিং দেয়ার পর ওকে পাঠানো হয়েছে কলকাতা থেকে। কিন্তু এই শক্তিশালী ডিনামাইট দিয়ে কী ধ্বংস করতে চায় এরা? রাহাত খানের কথা মনে পড়ল, 'বিরাট কোন পরিকল্পনার প্রায় সমাপ্তির দিকে চলে এসেছে এরা। জানতে হবে তোমার, কি আছে প্যাকেটে, কাকে দেয়া হচ্ছে সেটা, আর কেন দেয়া হচ্ছে। ওদের সমস্ত কুমতলব বানচাল করে দিতে হবে।' কঠিন সঙ্কল্পের মৃদুহাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে।

পিছনের একটা ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে উঠে গিয়ে দাঁড়াল সুলতা। সাদা চক দিয়ে তার উপর একটা ডায়াগ্রাম আঁকল। তারপর লাল চক দিয়ে তিনটে জায়গায় গোল চিহ্ন দিল। রানা বুঝল, এবার বোঝানো হচ্ছে কোন জায়গায় ডিনামাইটগুলো বসাতে হবে।

নক্সাটা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। চেষ্টা করেও রানা কোন কিছুর সাথে এর মিল খুঁজে পেল না। ছবিটা যত্ন করে মনের মধ্যে গেঁথে নিল সে ভবিষ্যতের জন্যে।

আবার সোফায় এসে বসল সুলতা। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর একজন একটা নোট বই এগিয়ে দিল, তাতে কি সব লিখে দিল সুলতা।

হঠাৎ সুলতার সামনের লোক দু'জন উঠে দাঁড়াল। রানা চেয়ে দেখল পিছনের একটা দরজা দিয়ে ভারি পর্দা উঠিয়ে ঘরে ঢুকল সাড়ে ছ'ফুট লম্বা এবং সেই পরিমাণে চওড়া একজন লোক। কাঁধের উপর প্রকাণ্ড একটা মাথা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া ব্যাকব্রাশ করা চুল। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা। পরনে কড়া ইস্তিরির রুচিসম্পন্ন ট্রেন স্যুট। লোকটা ঘরে ঢুকল ডান পা-টা একটু টেনে টেনে।

সুলতা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, লোকটা ওকে বসতে বলে অপর দু'জনকেও বসবার ইঙ্গিত করল। তারপর নিজে সুলতার পাশে বসে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস

করল। সামনের একজনকে কিছু একটা আদেশ করতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার বিদায় গ্রহণের পালা। সাড়ে দশটা বাজে। সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মিষ্টি হেসে বিদায় দিতে এগিয়ে গেল নতুন আগন্তুক।

সুলতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই পা টিপে আবার দোতলায় উঠে এল রানা। গাড়ি বারান্দার ঠিক মাথার উপরের ব্যালকনিতে একটা মোটা থামের আড়াল থেকে শুনল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে উঁচু গলায় সুলতা বলছে, 'গেটটা কাউকে একটু খুলে দিতে বলুন, মি. চৌধুরী।'

'আপনি রওনা হন। এখান থেকে বোতাম টিপলে আপনি খুলে যাবে গেট,' ভারি গলায় উত্তর এল।

রানা ভাবল সুইচটা কোথায় আছে দেখতে পেলে হত। কিন্তু তখন আর নিচে নামার সময় নেই।

সামনেটা আলোকিত করে গেটের কাছে চলে গেল ফোক্সওয়াগেন। গেটটা খুলে ভিতর দিকে ভাঁজ হয়ে গেল। হেডলাইটের আলোয় রানা পড়ল গেটের উপর প্লাস্টিকের নেম প্লেটে লেখা:

কবির চৌধুরী
২৫৭ বায়েজিদ বোস্তামী রোড
চিটাগাং

গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই লোহার গেট বন্ধ হয়ে গেল। ক্লিক করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে তালা লেগে গেল গেটে। রানা ভাবল, আপাতত কাজ শেষ। কালকে শুরু হবে আসল কাজ। এখন আবার পাইপ বেয়ে নামা, ড্রেন গলে বেরিয়ে হোটেলে ফেরা। ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'হ্যাণ্ডস্ আপ!'

চমকে উঠল রানা। উদ্যত রিভলভারের নলটার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে মি. চৌধুরীর আদেশে যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেই লোকটা। রানা এক পা এগোতেই উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ব্যালকনিতে। গর্জন করে উঠল লোকটা, 'খবরদার! আর এক পা এগিয়েছ কি গুলি করব। কোন চালাকি চাই না—মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

ধীরে দু'হাত মাথার উপর তুলে ধরল রানা। ঠিক সেই সময় আরও দু'জন লোক উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। একজনের উদ্দেশে লোকটা বলল, 'হাবীব, দেখো তো এর সাথে কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা।'

হাবীব ও তার সাথের লোকটা এগিয়ে এল রানার দিকে। রানা বুঝল, এই সুযোগ। রিভলভার থেকে যেই হাবীব ওর দেহটা আড়াল করেছে অমনি এক ঝটকায় পিস্তল বের করে ফেলল সে। কিন্তু তীক্ষ্ণ বলশালী একটা হাত চেপে ধরল ওর কব্জি। হাবীবের পাশের লোকটা। কব্জিটা ধরে বিশেষ কায়দায় একটা মোচড় দিতেই ঠিক শিশুর হাতের খেলনার মত রানার অটোমেটিক ওয়ালথারটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। হাবীব ওটা তুলতে গেছে, হাঁটু দিয়ে ওর চিবুকে কায়দা মত একটা লাথি মারতে গিয়ে থেমে গেল রানা। ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর পিঠের উপর একটা তীক্ষ্ণ

ছুরির ফলা অল্প একটু বিধল। ততক্ষণে রিভলভারের সামনের আড়াল সরে গেছে। হাবীবের সাথের পাতলা-সাতলা লম্বা অথচ অসুরের মত বলশালী লোকটা রানার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'দুষ্টুমি করে না, খোকা। মারব।'

এই বিপদের মধ্যেও লোকটার রসিকতায় মৃদু হাসল রানা। ওর হাত দুটোকে পিছমোড়া করে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরল লম্বা লোকটা। চেষ্টা করেও এক বিন্দু আলগা করতে পারল না রানা সে মুঠো। ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিচতলার একটা দেয়ালের সামনে নিয়ে আসা হলো রানাকে। বোতাম টিপতেই দেয়ালটা দু'ভাগ হয়ে গিয়ে একটা দরজা বেরিয়ে পড়ল। মাঝারি আকারের একটা ঘরের ভিতর চলে এল রানা। হাবীব রয়ে গেল বাইরে। লম্বা লোকটার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল রিভলভারধারী। পিছনের দেয়ালটা আবার জোড়া লেগে গেল।

'লাইব্রেরিতে নিয়ে এসো।' ভারি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে, কিন্তু কোন লোকের দেখা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে রানা দেখল দেয়ালের গায়ে স্পীকার বসানো আছে একটা।

ততক্ষণে তাকে আরেকটা দেয়ালের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই উপায়ে দরজা তৈরি হলো সে দেয়ালে। রানার মাথায় তখন অতি দ্রুত কয়েকটা চিন্তা ঘুরছে। এখান থেকে বেরোবার কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে সে।

দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরটা পুরু সবুজ ভেলভেটে ঢাকা—তারই ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কবীর চৌধুরী। সামনের টেবিলের উপর একটা মোটা ইংরেজি বই পড়তে পড়তে উল্টে রাখা। চট করে নামটা দেখে নিল রানা। এইচ. এ. লরেঞ্জ-এর লেখা 'প্যাটার্ন অভ ইলেকট্রন্স'।

'আসুন, আসুন! বসুন।' নরম স্বাভাবিক গলায় আপ্যায়ন করল কবীর চৌধুরী। যেন কিছুই ঘটেনি, এমনি ভাব।

পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসানো হলো রানাকে ডেস্কের দিকে মুখ করে। হাতটা ছেড়ে দিল লম্বা লোকটা। রানাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ। হাত দুটো ঝুলিয়ে রাখল রানা চেয়ারের হাতলের দুই পাশে। চিনচিনে মৃদু ব্যথার সঙ্গে আবার রক্ত চলতে শুরু করল।

কোন কথা না বলে কবীর চৌধুরী আপাদমস্তক লক্ষ করছিল রানাকে। দৃষ্টিটা স্থির এবং একাগ্র। মনে হলো যেন অন্তস্তল ভেদ করে বেরিয়ে গেল সে দৃষ্টি। যেন কিছুই এর নজর থেকে গোপন রাখার উপায় নেই। ঝিরঝির করে এয়ার কণ্ডিশনারের মৃদু গুঞ্জন আসছে ঘরের এক কোণ থেকে। এই প্রথম রানা অনুভব করল অত্যাশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব। চোখে মুখে চেহারায় সবদিক থেকে যেন প্রতিভা এবং শক্তির বিচ্ছুরণ হচ্ছে। অদ্ভুত প্রাণবন্ত একটা মানুষ। মস্তবড় মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল তেলের অভাবে কিছুটা রুক্ষ। বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে।

রানা লক্ষ করল কবীর চৌধুরীর গায়ের রঙটা তিনদিনের পানিতে ডোবা প্রায় পচে ওঠা মড়ার মত। যেন বহুদিন ছিল মাটির তলায়, বাইরের আলো-বাতাসের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত।

ট্রেনের কোটটা খুলে একটা হ্যাঙ্গারে ঝোলানো। সাদা স্টিফ কলার শার্টের

নিচে গেঞ্জির অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে কয়েকটা বাঁকা রেখায়। অনামিকায় মস্ত বড় একটা হীরের আংটি উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করছে। জুলফির কাছে কয়েকটা পাকা চুল আভিজাত্য এনেছে চেহারায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে রানাকে লক্ষ করল মি. চৌধুরী। রানাও পাল্টা লক্ষ করল তাকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর ঘরের চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সৌখিন কোটিপতির লাইব্রেরির মত সাজানো গোছানো ঠাণ্ডা ও নীরব এই ঘরটা। বোধহয় সাউণ্ড-প্রুফ করা। থরে থরে সরু-মোটা অনেক বই সাজানো বারো চোদ্দটা বড় বড় আলমারিতে। কবির চৌধুরীর ঠিক মাথার উপর পিছনের দেয়ালে টাঙানো স্বামী বিবেকানন্দের মস্ত এক অয়েল পেন্টিং।

রানা ভাবছিল, এই লোকটাই কি সেই বিখ্যাত চৌধুরী জুয়েলার্সের মালিক? তবে এর বাড়িতে অত বড় গুদাম ঘর কিসের? বাড়িটা এমনভাবে সুরক্ষিত করবার কি দরকার? ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের সাথে এর কি সম্পর্ক? তার উপর স্বামী বিবেকানন্দের ছবি, অ্যাডভান্সড ফিজিক্সের বই। ঠিক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কথা বলল কবীর চৌধুরী, 'কোন বদ উদ্দেশ্য থাকলে সাবধান হতে অনুরোধ করছি। প্রতিটি মুহূর্ত আমি প্রস্তুত আছি আপনার জন্যে। ফলটা শুভ হবে না।'

বৃথা হুমকি দেবার লোক কবীর চৌধুরী নয়। বাড়িটায় ঢুকে এতক্ষণে যা দেখেছে, তাতে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেছে রানার কাছে—এ লোকের প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যবস্থায় অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় আছে, এবং সেই সাথে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতার ইঙ্গিত।

কবির চৌধুরীর চোখের দিকে চাইল রানা।

'আপনার নাম?' রানার চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। যেন এক বিন্দু মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে।

'সুবীর সেন।'

পলকের জন্যে ভুরু জোড়া একটু কোঁচকাল কবীর চৌধুরী। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সুবীর সেন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'সুলতা রায়কে আপনিই গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছেন বসন্তপুর থেকে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তা, কি কারণে এই গরীবালয়ে পদার্পণ?'

'হেড অফিসের হুকুম।'

'বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা।'

'বিশ্বাস করাবার মত যুক্তি আমার পকেটে আছে, মি. চৌধুরী।'

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করল রানা। টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল সেটা। কবীর চৌধুরী একবার চোখ বুলাল সাঙ্কেতিক চিঠিটার উপর। এবার আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার চোখ দুটো।

'এ চিঠির যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তা বের করতে আমার পনেরো মিনিট সময় লাগবে। যাক, আপাতত ধরে নিলাম আপনি সুবীর সেন। কিন্তু আমার

বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছেন কেন?' চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল কবির চৌধুরী।

'সুলতা রায়কে অনুসরণ করবার আদেশ আছে আমার উপর। ডিনামাইটগুলো ঠিক হাতে পৌঁছল কিনা এবং ঠিকমত ব্যবহার করা হলো কিনা তার দিকে নজর রাখার ভার দেয়া হয়েছে আমাকে। তাই গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে সুলতার সাথেই ঢুকেছি এ বাড়িতে।'

'সুলতার গাড়িতে আপনি আসেননি—এসেছেন ওপেল রেকর্ডে করে।' কবীর চৌধুরীর হাসি-হাসি মুখটা গম্ভীর থমথমে হয়ে গেল। মনে হলো রানার মুখের উপর কেউ যেন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। তীব্র দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'মিছে কথা আমি বরদাস্ত করি না, সুবীর বাবু। আপনি ভুল করছেন। মিথ্যে বলে আজ পর্যন্ত আমার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। আপনিও পাবেন না।'

টেবিলের উপর থেকে একটা পাইপ তুলে নিয়ে তার মধ্যে টোবাকো ভরে নিল কবীর চৌধুরী চামড়ার পাউচ থেকে। একটা লাইটার দিয়ে সেটা ধরিয়ে আঙুল দিয়ে টিপে আগুনটাকে সবটা জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে দিল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা তো বটেই, আপনার ডান হাতটাও প্রমাণ করছে যে আপনি সুলতার সঙ্গে আসেননি, দেয়াল টপকাতে গিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছেন ইলেকট্রিসিটির। আমি তখন এখানে ছিলাম না। হঠাৎ বাতির আলো কমে যাওয়ায় এ বাড়ির কারও কাছেই আপনার আগমন গোপন ছিল না। তবে এরা ভাবতেও পারেনি যে ভাগ্যক্রমে নর্দমাটা পেয়ে যাবেন আপনি। এতক্ষণে সে পথটা বন্ধ করা হয়ে গেছে। এ বাড়িতে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা লক্ষ করেছি। কাজেই মিথ্যে কথা না বাড়িয়ে বলে ফেলুন আপনি কে, এবং কেন এ বাড়িতে প্রবেশ করেছেন।'

'আপনিও মিথ্যে বকর বকর না করে চিঠিটা পড়ে দেখুন, মি. চৌধুরী। তারপর আমাকে যেতে দিন।'

'চিঠিটা পড়ে দেখলেও আপনাকে যেতে দেয়া হবে না। এ বাড়িতে ঢোকা যদিও একেবারে অসম্ভব নয়—কারণ দেখতেই পাচ্ছি আপনি ঢুকেছেন—কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব।'

'তার মানে?'

'মানে হচ্ছে, আজ আর হোটেলে ফেরা আপনার কপালে নেই, সুবীর বাবু। কেবল একটা চিঠিতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তাছাড়া আপনার কথায় অনেক গোলমাল আছে। শুনুন। আপনি বলছেন, হেড অফিসের হুকুমে আপনি এ বাড়িতে প্রবেশ করেছেন। অথচ আপনার হেড অফিস আমার বাড়ির দেয়ালের ওপর ইলেকট্রিক তারের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা সত্ত্বেও আপনাকে সাবধান করে দেয়নি—এ কেমন কথা? তার ওপর আপনার জুতো জোড়া।' ঘরের এক কোণের দিকে চাইল চৌধুরী। রানাও দেখল একটা টী-পয়ের উপর সাজানো রয়েছে ওর জুতো জোড়া। 'ওগুলো ঢাকার বিউটি ফুট ওয়্যারের তৈরি। ওগুলোর গোড়ালিতে যে চোরা কুঠুরি আছে তার মধ্যের ছুরি বিশেষ কায়দায় তৈরি হয়েছে

শিয়ালকোট থেকে। ভারতীয় গুপ্তচরের এসব গুপ্ত জিনিস কি আজকাল পাকিস্তান সাপ্লাই দিচ্ছে?'

'দেখুন, আপনি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করছেন। আমি...'

বাধা দিয়ে গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী, 'মিথ্যে আমি কাউকে সন্দেহ করি না, সুবীর বাবু। রাস্তার উপর যে ওপেল রেকর্ড রেখে এসেছেন সেটা পি.সি.আই-এর চিটাগাং-এজেন্ট আবদুল হাইয়ের। আপনি বলতে চান পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসকে পূর্ব পাকিস্তানের এক মহা ধ্বংস-লীলায় সাহায্য করছে? সেটা সম্ভবপর হলে আমি এদের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতাম, ভারত সরকারের কাছে হাত পাততে হোত না। বুঝতে পারছেন আমার কথাটা? এখন বলুন, আপনার পরিচয়?'

চুপ করে থাকল রানা। এর চোখে ধুলো দেয়া সহজ কথা নয়।

'চুপ করে থেকে কোন লাভ নেই, সুবীর বাবু। কথা আপনাকে বলতেই হবে—এবং সত্যি কথা। এর উপর নির্ভর করছে আপনার থাকা বা না থাকা। দেখুন, আমি বৈজ্ঞানিক মানুষ, এখন এক ভয়ঙ্কর খেলায় নেমেছি। যে-কোন রকম বাধা অতিক্রম করবার ক্ষমতা আমার আছে। আপনি যদি সত্যি কথা বলেন তবে আপনার অবশ্যম্ভাবি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার একবিন্দু ভরসা থাকতেও পারে। মিছেমিছি প্রাণী হত্যা আমি পছন্দ করি না। আমার পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আপনি কতটুকু ক্ষতিকর ভূমিকা নিতে পারেন জানতে পারলে আপনার সম্বন্ধে সেই পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সুবিধে হত। হয়তো এমনও হতে পারে, মাত্র কয়েকটা হাড়গোড় ভেঙে আপনাকে বর্মা মুলুকে সরকারী পুলিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। সেখান থেকে নাকানি চুবানি খেয়ে দেশে ফিরতে ফিরতে কয়েক মাস লেগে যাবে—কয়েক বছরও লাগতে পারে—কিন্তু বেঁচে তো গেলেন! কিন্তু কথা না বললে সবচাইতে সহজ পথটাই বেছে নিতে হবে আমাদের।'

পাইপটা নিভে গিয়েছিল। আবার ধরিয়ে নিল কবীর চৌধুরী। কিছুক্ষণ মগ্ন-চিত্তে পাইপ টানার পর আবার বলল, 'আর আপনার ভাগ্যক্রমে যদি কাল সকালে সুলতা দেবী এসে আপনাকে সুবীর সেন বলে সনাক্ত করেন তবে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে আপনাকে আমরা সসম্মানে মুক্তি দেব।'

'এখুনি মিসখায় টেলিফোন করে সুলতাকে ডেকে পাঠান না।' এতক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পেল রানা।

'এত রাতে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? আচ্ছা, বেশ। আপনি যখন এত উতলা হয়ে পড়েছেন হোটেলে ফিরবার জন্যে, তখন দেখছি ফোন করে।'

রিসিভার তুলে ডায়াল করল কবীর চৌধুরী। রানা পিছনে চেয়ে দেখল ওর ওয়ালথার পি. পি. কে. আলগাভাবে হাতের মুঠোয় ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অস্থিসর্বস্ব লম্বা লোকটা। রিভলভারধারী কখন কবীর চৌধুরীর গোপন ইঙ্গিতে নিঃশব্দে সরে গেছে পিছন থেকে।

'হোটেল মিসখা?...সুলতা দেবীকে ডেকে দিন তো দশ নম্বর রুম থেকে।...না তো, একটু আগে আমি রিঙ করিনি।...নেই? (কপালটা একটু কোঁচকাল কবীর চৌধুরী)...বাবুর সাথে বেরিয়ে গেছে? কখন?...আচ্ছা ঠিক আছে।'

রানা ভাবছে, এতক্ষণে তো হোটেলে পৌঁছে যাবার কথা। এ নিশ্চয়ই হাসান আলীর কাজ।…হোটেলে তাহলে একটু আগে কেউ ফোন করেছিল? নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে টেলিফোন! তবে কি তার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে? সুলতাকে যখন চেয়েছিল ফোনে তখন নিশ্চয়ই তাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে ঢাকা থেকে কেউ করেছিল এই ফোন।…এখানেও তো ওরা ফোন করে জানাবে তাহলে! কোন ভাবে খবরটা আটকানো যায় না? ফোনের তারটা ছিঁড়ে ফেললে কেমন হয়? ফোনটা হাতে পাওয়ার জন্যে বলল রানা, 'সুলতা হোটেলেই আছে। আমিই ওকে নিষেধ করেছি বাইরের কারও ফোন ধরতে। আমাকে দিন, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি।'

টেলিফোনটা কবীর চৌধুরী এগিয়ে দিতে যাবে এমন সময় রানাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোন। ক্রিং ক্রিং…ক্রিং ক্রিং।

'কবীর চৌধুরী বলছি।…আচ্ছা, বলুন!…কে সুলতা? এই কিছুক্ষণ আগে হোটেলে ফিরে গেল।…কি বললেন? সুবীর সেন ঢাকার আর্মি হাসপাতালে? তবে সুলতাকে বসন্তপুর থেকে আনল কে?…মাসুদ রানা? (চট্ করে একবার রানার ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়ে নিল কবীর চৌধুরী, তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ মন দিয়ে শুনল ফোনের কথাগুলো।)…বুঝলাম, কিন্তু পি.সি.আই. কেবল চিঠিটা দেখে আর কি বুঝবে? এখানে কি হচ্ছে বা হতে চলেছে তার কিছুটা জানতে পেরেছে কেবল মাসুদ রানা। আপনাদের অত চিন্তার কারণ নেই। মাসুদ রানা এখন আমার হাতে বন্দী। কাল ভোরে এ পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে ওকে চিরতরে মুক্তি দেব…হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার এলাকায় আমি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম।…নিশ্চিন্ত থাকুন, সুলতা নিরাপদে কলকাতা পৌঁছবে, আজ রাতেই সরিয়ে ফেলব ওকে মিসখা থেকে…ঠিক আছে, সমস্ত দায়িত্ব আমি নিলাম।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে চেয়ে একটু হাসল মি. চৌধুরী।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় খুশি হলাম, মি. মাসুদ রানা। দেয়ালের ওপর অমন ভয়ঙ্কর শক খেলেন, তবু আমাদের লোক আপনাকে খুঁজে পাওয়ার আগেই ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভেতর। ভাবছিলাম কার এত দুঃসাহস? এখন পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, (একটুও দুঃখিত মনে হলো না তাকে) মৃত্যুর চাইতে হালকা আর কোন দণ্ড আপনাকে দিতে পারছি না, মি. মাসুদ রানা। তবে আমি চেষ্টা করব আপনার জন্যে যতদূর সম্ভব বেদনাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে।'

'আমার মৃত্যু হলেই মনে করেছ তুমি পার পেয়ে যাবে?'

রানার কথার কোন জবাব না দিয়ে লম্বা লোকটাকে কবীর চৌধুরী বলল, 'একে ঠাণ্ডা ঘরের পাশের কুঠুরিতে আটকে রাখো, ইয়াকুব। ভোর চারটেয় আমি ল্যাবরেটরিতে ফিরে যাব, তখন ওকে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় গাড়ির পেছনে দিয়ে দেবে। এখন যাও। সাবধান থাকবে। যদি বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করে তবে শেষ করে দেবে।'

একটা অশ্লীল গালি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে।

বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। সপাং করে একটা চাবুকের বাড়ি পড়ল রানার কাঁধের উপর। চমকে উঠল রানা। ততক্ষণে আবার নেমে আসছে চাবুক। ডান হাতে ধরে ফেলল রানা চাবুকটা, কিন্তু এক হেঁচকা টানে কবীর চৌধুরী

ছিনিয়ে নিল সেটা। স্টিংরে বা স্থানীয় ভাষায় শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। হাতের তালুর পোড়া জায়গাটার উপর দিয়ে জোরে ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল সেটা মুঠো থেকে। অবর্ণনীয় ব্যথায় নীল হয়ে গেল রানার মুখ। একটা চাপা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। হাতের রুমালটা লাল হয়ে গেল রক্তে।

'বেয়াদবীর শাস্তি!' বলে কবীর চৌধুরী মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ইয়াকুবকে।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল রানা। ইস্পাত কঠিন দুটো হাত এসে ওর ডান হাতটা ধরে মুচড়ে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে উপরে ঠেলতে লাগল। রানার মনে হলো হাতটা ভেঙে যাবে। ব্যথায় গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত গোঙানী মত শব্দ বেরোল ওর। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে।

'এগোও,' একটা ঠেলা দিল ইয়াকুব পিছন থেকে।

রানার পা এলোপাতাড়ি পড়তে লাগল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ওরা একটা লম্বা বারান্দায় পড়ল। দু'পাশে দেয়াল।

'হাতটা ভেঙে যাবে! উহ্! আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি!' কাতর স্বরে বলল রানা। হাতটা একটু আলগা হোক, তাই চাচ্ছে ও।

'চোপ, শালা!' ধমকে উঠল ইয়াকুব, কিন্তু কব্জিটা ইঞ্চি তিনেক নামিয়ে দিল পিঠের উপর। রানা ভাবছে, তলপেট, কণ্ঠনালী বা অণ্ডকোষ—এই তিন জায়গা হচ্ছে দুর্বলের লক্ষ্যস্থল।

ইচ্ছে করেই একবার হোঁচট খেলো রানা। ইয়াকুবের গায়ের সাথে ধাক্কা লাগল ওর। আন্দাজ পাওয়া গেল দু'জনের মধ্যের দূরত্বটা ঠিক কতখানি।

এবার হঠাৎ রানা ডানধারে একটু সরে গেল এবং বাঁ হাতটা সটান সোজা রেখে খুব জোরে পিছন দিকে চালাল। ধাঁই করে হাতটা লক্ষ্যবস্তুর উপর পড়তেই তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বেরোল ইয়াকুবের মুখ থেকে। ডান হাতটা ঢিল পেয়ে পিঠের উপর থেকে নামিয়ে আনল রানা। ইয়াকুব ততক্ষণে যন্ত্রণায় বাঁকা হয়ে গেছে। দুই হাত দিয়ে সে দুই উরুর মাঝখানটা চেপে ধরেছে। দু'পা পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি মারল রানা ওর পাঁজরের উপর। ছিটকে গিয়ে পাশের দেয়ালে পড়ল লোকটা—ভয়ানক জোরে মাথাটা ঠুকে গেল দেয়ালের সাথে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ইয়াকুব, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত মাসুদ রানার প্রচণ্ড লেফট্ কাট্ এসে পড়ল ওর নাকের উপর।

ইয়াকুবের লম্বা দেহটা দড়াম করে মাটিতে পড়তেই রানা চোখ-মুখের ঘাম মুছে নিল হাতের পিছন দিক দিয়ে, তারপর ইয়াকুবের পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে নিল। যেদিকে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেদিকেই এগোল রানা। কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে দোতলার উপর যে লোকটা রানাকে প্রথম ধরেছিল, তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই আগের মতই বলে উঠল লোকটা, 'হ্যাণ্ডস আপ!'

পিস্তল ধরাই ছিল হাতে, এক নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করল রানা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল লোকটা, মুখটা খোলাই থাকল, আওয়াজ বেরোল না। দু'হাতে নিজের বুকটা চেপে ধরল সে। তারপর ঢলে পড়ে গেল মাটিতে। হাতের রিভলভার থেকে একটা গুলি ছুটে বেরিয়ে ছাতে লাগল—কিছুটা চুন-সুরকি খসে পড়ল ওর মৃতদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টির মত।

এবার সামনের দিকে ছুটল রানা। যেভাবে হোক বেরোতে হবে এখান থেকে। পিস্তল আর রিভলভারের আওয়াজ এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ির অন্য সবাই টের পেয়ে গেছে।

বারান্দাটা কিছুদূর সোজা গিয়ে আবার বাম দিকে মোড় ঘুরেছে। আরও খানিকটা গিয়ে দেখা গেল সামনে দেয়াল, আর পথ নেই। কায়দা জানাই ছিল, যে ক'টা বোতাম পেল হাতের কাছে সব এক এক করে টিপতে আরম্ভ করল। হঠাৎ দেয়ালটা ফাঁক হয়ে গেল 'ওপেন সিসেম'-এর মত। একটা বড় হলঘর। ঘরে ঢুকেই রানা বুঝতে পারল এই ঘরেই সুলতা বসে ছিল কিছুক্ষণ আগে। টেবিলের উপর থেকে ডিনামাইটগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মাসুদ রানা, যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ো। এক পা নড়াচড়া করলে মারা পড়বে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝল, ওটা লাউড স্পীকারের ধোঁকাবাজি। এক সেকেণ্ডে বাড়িটার নক্সা চিন্তা করে নিল রানা। ডান দিকে যেতে হবে ওর এখন। ঘরের ডানধারে দেয়ালের গায়ে একটা পর্দা সরিয়ে দেখা গেল ওটা বাথরুম। আরেকটা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে এল রানা। যেন গোলক-ধাঁধা। এর থেকে বেরোবার পথ কোন্ দিকে? আবার খুঁজতে খুঁজতে মস্ত আলমারির পিছনে একটা বোতাম পাওয়া গেল। সামনের দেয়ালটা ফাঁক হতেই অবাক হয়ে দেখল রানা ফাঁকা মাঠ দেখা যাচ্ছে সামনে। একটা সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নামলেই বাড়িটার পিছন দিকের প্রাঙ্গণ।

লাফিয়ে নেমে গেল রানা মাঠের মধ্যে। তারপর এক ছুটে চাকরদের ব্যারাকের বারান্দায় গিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে রানার সমস্ত আশা ভরসা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল গোটা চারেক ফ্লাড লাইট। সারা মাঠ এখন দিনের মত পরিষ্কার। দ্রুত তিনটে গুলি করে রানা তিনটে ফ্লাড-লাইট নিভিয়ে দিল, কিন্তু পঞ্চাশ গজ দূরে গুদাম ঘরের মাথায় যেটা জ্বলছে সেটাতে গুলি লাগল না।

এমন সময় ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলে এক সাথে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। রানার আশপাশে গুলিগুলো এসে বিঁধল, কোনটা দরজায়, কোনটা দেয়ালে। এক লাফে সরে গিয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে দেখল রানা ছয়-সাত জন লোক রাইফেল নিয়ে এগোচ্ছে ওর দিকে। একজনের হাতে আবার একটা থমসন মেশিনগান। এই প্রথম রানার আফসোস হলো এক্সট্রা ম্যাগাজিন সাথে না রাখার জন্যে। তার পিস্তলে আর মাত্র তিনটে গুলি অবশিষ্ট আছে। এতগুলো লোককে সে ঠেকাবে কি করে? শিরশির করে মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ভয়ের শিহরণ উপরে উঠে এসে ওর মাথার পিছনের চুলগুলোকে খাড়া করে দিল।

কাছেই একটা লাউড স্পীকারে কে যেন বলল, 'হাত তুলে দাঁড়াও, মাসুদ রানা, নইলে কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরবে।'

এবার পাগলের মত ছুটল রানা গুদাম ঘরের দিকে। আরও এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে। একটা পীচের ড্রামের আড়ালে বসে দুটো গুলি করল রানা। একজন রাইফেলধারী চিৎকার করে চিৎ হয়ে পড়ল। বাকি সবাই শুয়ে

পড়ল মাটিতে। আবার দৌড়াল রানা। মাত্র একটা গুলি অবশিষ্ট আছে চেম্বারে। শোল্ডার হোলস্টারের মধ্যে রেখে দিল রানা পিস্তলটা। তারপর এক লাফে উঠে বসল মার্সিডিজ লরির ড্রাইভিং সীটে।

লরিটায় স্টার্ট দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের উইণ্ড-শীল্ডে কয়েকটা ফুটো হয়ে গেল। ভাঙা কাঁচের টুকরো ছিটকে এসে বিঁধল রানার চোখে মুখে।

মাথা নিচু করে লোকগুলোর দিকে জোরে লরি চালিয়ে দিল রানা। গোলা-গুলি বন্ধ করে যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ে জান বাঁচাল ওরা। এবার সোজা গেটের দিকে চলল লরি। আবার আরম্ভ হলো পিছন থেকে গুলিবর্ষণ। গেটের কাছাকাছি আসতেই পিছন দিকে একটা গ্রেনেড ফাটল বলে মনে হলো রানার। কিন্তু এখন আর ফিরে চাইবার অবসর নেই। সাত টনী মস্ত লরি হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল গেটের উপর। স্টীলের গেট দেয়াল থেকে খসে শুয়ে পড়ল মাটিতে। মৃদু হেসে রানা বড় রাস্তায় চলে এল লরি নিয়ে।

লরিটা সেখানেই রেখে রাস্তায় নেমে বাড়িটার দিকে চাইল একবার রানা। দোতলার বারান্দায় উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল কবীর চৌধুরীর প্রকাণ্ড দেহটা।

স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে রানার দিকে।

হাত নেড়ে টাটা করল রানা।

পাঁচ

খুব দ্রুত হোটেলে ফিরবার প্রয়োজন অনুভব করল রানা। নির্জন রাস্তায় স্পীড-মিটারের কাঁটা মাঝে মাঝে '৮০'-কে স্পর্শ করল। সেই সাথে রানার অতি দ্রুত চিন্তা স্পর্শ করল কয়েকটা বাস্তব সত্যকে।

এত কাণ্ডের পরও কবীর চৌধুরী ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকল। তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও সংগ্রহ করা যায়নি। পুলিস ওর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। ডিনামাইটগুলো নিয়ে কি করা হবে জানতে পারেনি রানা। যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে ওদের কার্যকলাপ, অথচ রানা নিজেকে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছে শত্রুপক্ষের কাছে। এখন যে-কোন দিক থেকে যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ চালাবে কবীর চৌধুরী। লক্ষ্যবস্তু তার জানাই আছে। মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে এখন রানার মাথার উপর। ওকে শেষ করে দিতে পারলেই কবীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে সব তথ্য চাপা পড়ে যাবে। চেষ্টার কোন ক্রটি করবে না এই অসামান্য প্রতিভাবান দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক।

এখন একমাত্র ভরসা সুলতা রায়। ওকে যদি এতক্ষণে সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকে তবেই সর্বনাশ। কোন কিছুকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাবার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আজ রাতেই সুলতাকে সরিয়ে ফেলবে বলছিল কবীর চৌধুরী। যেমন করেই হোক ঠেকাতে হবে তাকে।

সুবীর বাবু বাইরে গেছে শুনে একটু অবাক হলো সুলতা রায়। ভাবল কাছেই

কোথাও গেছে বুঝি। ঘরে ঢুকে দেখল টেবিলের উপর দু'জনের খাবার সাজানো আছে। পাশে একটা চিঠি। ভাঁজটা খুলে দেখল তাতে লেখা:

লতা

আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। সাড়ে
দশটার মধ্যে না ফিরলে খেয়ে
নিয়ে শুয়ে পোড়ো।

সুবীর

খিদেও লেগেছে, আর সাড়ে-দশটাও গিয়েছে বেজে। খেয়ে নিল সুলতা। বাথরুমে গিয়ে ঠোঁট-মুখের প্রলেপ আর কপালের টিপ উঠিয়ে ফেলল সে। বিড়ে খোঁপা খুলে চুলগুলো আলতো করে পেঁচিয়ে নিল হাত-খোঁপায়।

শাড়ি পরে ঘুমাতে পারে না সুলতা, কিন্তু ওটা খুলে রাখতে লজ্জা লাগল ওর। কখন যে তার স্বামীদেবতা এসে উপস্থিত হবে ঠিক নেই। বিছানায় উঠে বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল ঘরের। চোখটা বন্ধ করতেই সুবীর সেনের (রানার) মুখটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল মনের পর্দায়। চেষ্টা করেও সে ছবি মুছে ফেলতে পারল না সুলতা। মৃদু হেসে মনে মনে কয়েকবার বলল, 'তোমায় ভালবাসি, সুবীর। তোমায় আমি ভালবেসে ফেলেছি।' তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল সে।

অন্ধকার ঘরে গায়ে হাত পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল সুলতার। তন্দ্রাচ্ছন্ন আড়ষ্ট কণ্ঠে 'কখন এলে' বলে পাশ ফিরে শুলো সে। মনে হলো সুন্দর একটা ফুলের বাগানে কচি কচি ঘাসের উপর বসে আছে ও আর সুবীর সেন। আলতো করে সুবীর ধরে আছে ওর হাত। রঙ ধরেছে পশ্চিমের মেঘে।

হঠাৎ মনে হলো, দরজা খুলল কি করে সুবীর? সে তো নিজ হাতে দরজায় খিল দিয়ে তারপর ঘুমিয়েছিল! ঘরের মধ্যে একটু দূরে 'খুক' করে কে যেন একটা কাশি দিল। এবার চোখ থেকে তন্দ্রার রেশটুকু কেটে গেল সুলতার। বেড সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই একটা টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ল ওর মুখের উপর। কানের কাছে মোটা কর্কশ গলায় কেউ বলল, 'টু শব্দ করেছ কি খুন হয়ে যাবে। চুপ করে থাকো।'

কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সুলতার, ঢোক গিলবার চেষ্টা করল সে। এবার তৃতীয় ব্যক্তি ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিল। প্রথম জন একটা রুমাল ভরে দেবার চেষ্টা করল সুলতার মুখের মধ্যে। ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই বিছানার উপর লাফিয়ে উঠে বসে বাধা দেবার চেষ্টা করল সুলতা। কিন্তু একা মেয়েমানুষ তিনজন গুণ্ডার সাথে পারবে কেন? মুখটা চেপে ধরল একজন। প্রাণপণে আঁচড়ে-কামড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল সুলতা। কিন্তু দ্বিতীয়জন ওর হাতদুটো বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। এবার সহজেই নোংরা ঘামে ভেজা রুমালটা ওর মুখের মধ্যে ভরে দিল প্রথম জন। তার উপর আরেকটা রুমাল দিয়ে মুখটা পেঁচিয়ে গিঁঠ দিয়ে দিল পিছন দিকে। তারপর গা থেকে খসে পড়া আঁচল দিয়ে পা দুটো শক্ত করে বেঁধে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে।

তৃতীয় ব্যক্তিকে আদেশ করা হলো, 'আলোটা নিভিয়ে দে। রিভলভার হাতে

আমার দু'পাশে চলবি দু'জন।'
'ঠিক হ্যায়, ওস্তাদ!'

হোটেলের সামনে ফোক্সওয়াগেন ছাড়াও আরেকটা হুড খোলা টয়োটা জিপকে দাঁড়ানো দেখে একটু অবাক হলো রানা। সামনের কলাপ্সিবল গেটটায় তালা দেয়া। গলি দিয়ে ঢুকতে গিয়েই দেয়ালের আড়ালে সরে দাঁড়াল সে। ব্যাপার কি? আধো-অন্ধকারে দেখা গেল কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছে গলি দিয়ে। তাদের মধ্যে একজন কিছু একটা ভারি জিনিস বয়ে আনছে।

লোকগুলো গলির মুখ থেকে বেরোতেই সুলতার সাথে চোখাচোখি হলো রানার। দপ করে আশার আলো জ্বলে উঠল ওর বড় বড় চোখ দুটোয়। হুড খোলা গাড়িটার দিকে এগোল লোকগুলো।

এক সেকেণ্ডে মনস্থির করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা বাম দিকের লোকটার উপর। বাঁ কানের উপর রানার প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে 'বাপরে' বলে ছিটকে পড়ল লোকটা তার পাশের জনের ওপর। টপ টপ করে কান থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে ফুটপাথের উপর পড়ল।

'শালা, হারামী!' বলে এবার অতর্কিতে এক প্রচণ্ড লাথি মারল রানা ডান দিকের লোকটার তলপেটে। ছিটকে পড়ে গেল রিভলভারটা দূরে। 'কোঁক' করে একটা চাপা শব্দ করে সে-ও বসে পড়ল মাটিতে।

ঘটনাটা এত হঠাৎ ঘটে গেল যে সামনের লোকটা ভাল করে বুঝতেই পারল না পিছনে কি ঘটছে। 'ক্যয়া হুয়া রে?' বলে ভারি বোঝাটা নিয়ে যেই ঘুরছে সে, অমনি ধাঁই করে নাকের উপর পড়ল একটা বিরাশি সিক্কা।

সুলতাকে ধপাস করে ফুটপাথের উপর ফেলে দিয়ে নিজের নাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। দুই-তিন টানে সুলতার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল রানা। এমন সময় পিছন থেকে একজন এসে চুলের মুঠি চেপে ধরল রানার। ঠিক স্টীম এঞ্জিনের পিস্টনের মত রানার কনুই গিয়ে পড়ল পিছনের লোকটার ভুঁড়ির উপর সোলারপ্লেক্সাস-এ। চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা।

মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটানে সুলতাকে নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। বলল, 'এক দৌড়ে ওপরে চলে যাও। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিয়ো। আমি ছাড়া আর কেউ ডাকলে বা দরজা খোলার চেষ্টা করলে চিৎকার করে লোক জড়ো করবে। যাও, দৌড় দাও। আমি আসছি।'

প্রথম যাকে আক্রমণ করা হয়েছিল সেই লোকটা সামলে নিয়ে এবার একটান দিয়ে রিভলভারটা বের করল ওয়েস্ট ব্যাণ্ড থেকে। সাথে সাথেই গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। ডান হাতের কব্জিটা ভেঙে গুঁড়ো করে দিল পয়েন্ট থ্রী-টু বুলেট। 'বাবা-গো' বলে কাতরাতে লাগল লোকটা মাটিতে বসে পড়ে।

মাটি থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে রানা হুকুম করল, 'সোজা গাড়িতে গিয়ে ওঠো সবাই। কেউ কোন চালাকির চেষ্টা করলেই মারা পড়বে।'

দলপতি একবার রানার ইস্পাত-কঠিন চেহারার দিকে চাইল। বুঝল, খুন করতে এই লোক দ্বিধা করবে না। অপর দু'জনকে বলল, 'চ্যল্ বে, ভাগ্ ইয়াহাঁসে!'

তলপেটে ল্যাথি খাওয়া লোকটা তার রিভলভার তুলে নেবার জন্যে এক পা এগোতেই রানা আবার বলল, 'ওটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে । যাও, সোজা গাড়িতে ওঠো।'

আহত লোকটাকে দু'জন ছেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল। তারপর ছেড়ে দিল গাড়ি। গলির সামনে দিয়ে যখন গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে কি মনে করে হঠাৎ রানা একপাশের দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট।

পাঁচ-দশ গজ গিয়ে আবার থামল গাড়িটা। বোধকরি গুলি দুটো ঠিক জায়গা মত লাগল কিনা দেখার জন্যে। আবার রানার হাতের রিভলভারটা গর্জে উঠল। একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল—এবং সাথে সাথেই একজস্ট পাইপের মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া বের করে দ্রুত চলে গেল গাড়িটা 'বিপণী-বিতানে'র দিকে।

ফুটপাথের উপর পড়ে থাকা রিভলভারটা তুলে নিল রানা। দেখল দুটোই ওয়েবলি অ্যাণ্ড স্কটের অনুকরণে ফ্রন্টিয়ারের দাররা-তে তৈরি থারটি-টু ক্যালিবারের রিভলভার। অনুকরণ এতই চমৎকার এবং নিখুঁত যে ধরাই যায় না যে এটা দেশী মাল। কিন্তু মহাপণ্ডিত পাঠান ছোট্ট একটা ভুল করে বসে আছে, তাই ধরা গেল। নামটা লিখতে 'দু'একটা অক্ষর কখন যে এদিক ওদিক হয়ে গেছে, টের পায়নি। মৃদু হেসে প্যান্টের দুই পকেটে দুটোকে ভরে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে উঠে এল রানা দোতলায়।

ম্যানেজারের কাউন্টারে কেউ নেই। লাউঞ্জের দুটো টেবিল লম্বালম্বি ভাবে জুড়ে নিয়ে হাসান আলী শুয়ে আছে মাথার উপর একটা ফ্যান ফুল-স্পীডে চালিয়ে দিয়ে। একটু নাড়া দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল হাসান আলী।

'আমার কোনও টেলিগ্রাম এসেছে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'দুটো এসেছে, স্যার।'

বালিশের তলা থেকে দুটো খাম বের করে দিল সে। রানা দেখল দুটোই আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। একটা ওর নামে, আরেকটা সুলতার। খাম ছিঁড়ে দেখল রানা প্রথমটায় লেখা:

সামথিং হ্যাপেণ্ড ইন কাপতাই স্টপ মিট আই ই কো চীফ স্টপ ইনভেস্টিগেট অ্যাণ্ড রিপোর্ট।

আইটিসি

রানা ভাবল, কাপ্তাইয়ে আবার কি ঘটল? আগামী শুক্রবার অর্থাৎ পরশু তো প্রেসিডেন্ট ওপেন করছেন প্রজেক্ট। সাথে থাকবেন গভর্নর, ওয়াপদা চীফ, ইউ.এস. এ-র রাষ্ট্রদূত, আরও কত হোমরা-চোমরা অফিসার। সেখানে আবার এমন কি ঘটে গেল যে তাকে এমন আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করা দরকার হয়ে পড়ল?

দ্বিতীয় টেলিগ্রামে লেখা:

সেন হসপিটালাইযড অ্যাট ঢাকা স্টপ নেগোসিয়েশন ব্রোক ডাউন স্টপ ক্লোজ ডিল উইথ নিউ কোম্পানী স্টপ ফর সলভেনসি রেফার চৌধুরী।

জেটিটি

দুটো টেলিগ্রামই পকেটে ফেলে রানা বলল, 'ঢাকায় একটা ফোন করা দরকার

হাসান আলী। ফোনের চাবিটা কি তোমার কাছে?'

'খুলে দিচ্ছি, স্যার,' বলে হাসান আলী তালা খুলে দিল ম্যানেজারের কাউন্টারের উপর রাখা টেলিফোনটার। প্রথমে ৯১ ডায়াল করে ৮০০৮৩ ঘুরাল রানা। একবার রিং হবার সাথে সাথেই নারী কণ্ঠে শোনা গেল, 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন। মিস নেলী বলছি।'

'আমি চিটাগাং থেকে সুধীর সেন বলছি, ডারলিং। এক্ষুণি শ্রী রামকৃষ্ণের লাইন দাও, জলদি।'

'শাট আপ!' নেলীর কৃত্রিম রাগত স্বর শোনা গেল। ঠিক দুই সেকেণ্ড পরেই রাহাত খানের ঠাণ্ডা গম্ভীর গলা পাওয়া গেল।

'বলো। খবর আছে কিছু?'

'আমার স্ত্রীর কাছে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। তাতে দেখলাম ঢাকায় নাকি আমার এক বন্ধুর অসুখ...'

'ওসব জানি। তোমার কি খবর?' বাধা দিলেন রাহাত খান।

'শরীরটা বেশি ভাল যাচ্ছে না, স্যার।'

'খুব বেশি খারাপ?' (রানা অনুভব করল রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে।)

'না, স্যার, তেমন কিছু নয়, এই সামান্য। এখানে হাসপাতালের খবরও বেশি ভাল না—জনা তিনেক মারা গেছে। আমাকেও ডাক্তাররা ছাড়তে চাইছিল না।'

'আচ্ছা!'

'আরও একটা খবর, এই একটু আগে আমার স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল ওর তিনজন মাসতুত ভাই। এত রাতে আর দিলাম না যেতে। ওদের দু'জনের শরীরও বেশি ভাল দেখলাম না।'

'কাণ্ডই বাধিয়ে বসেছ দেখছি।'

'উৎসবে অনেক বাজি পটকা ফুটেছে। আমার শ্বশুর-বাড়িতে যদি একটা খবর দিয়ে দিতেন, স্যার, তাহলে আমি অনেক হয়রানি থেকে বাঁচতে পারতাম।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। আমি ফোন করে বলে দেব। তা তোমার জন্মদিনে কি উপহার পেলে অত বাক্স ভর্তি, বললে না?'

'একটা রেডিয়ো ট্র্যানজিস্টার আর তিনটে বড় বড় ডিনার সেট।'

'বলো কি? ডিনার সেট দিয়ে কি করবে?'

'দেখি কি করা যায়, এখনও ঠিক করতে পারিনি, স্যার।'

'তোমার বন্ধুদেরকে কবে নিমন্ত্রণ করছ শ্বশুর-বাড়িতে?'

'আলাপ হয়েছে, তবে এখনও নিমন্ত্রণের পর্যায়ে যায়নি। আমার পরিচয় পেয়ে অনেক খাতির যত্ন করল, ছাড়তেই চাচ্ছিল না।'

'বেশ, যা ভাল বোঝ করো। শরীরের দিকে লক্ষ রাখবে—বিশেষ করে আজ রাতে। আর কিছু বলার আছে?'

'না, স্যার।'

'রাখলাম।'

পাঁচতলায় উঠে এল রানা। ঘরের দরজায় ভিতর থেকে ছিটকিনি দেয়া। টোকা

দিতেই কাছে এসে রানার গলা শুনে নিশ্চিত হয়ে দরজা খুলল সুলতা। হাতে পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের ছোট্ট একটা অ্যাস্ট্রা পিস্তল ধরা। বাঁটটা মাদার অফ পার্লের। উজ্জ্বল বাতির আলোয় একবার ঝিক করে উঠল।

'ওরেব্বাবা! তোমার কামানের মুখটা একটু সরাও। গুলি বেরিয়ে পড়লে একেবারে ছাতু হয়ে যাব!' বলল রানা।

এসব রসিকতায় কান না দিয়ে উৎকণ্ঠিত সুলতা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লাগেনি তো?'

'সামান্য লেগেছে। তোমার?'

'আমার লাগবে কেন, আমি কি মারামারি করতে গেছি?' একটু থেমে আবার বলল, 'ইশ, তোমার গায়ে "করডাইট"-এর গন্ধ। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছ। কাপড়টা ছেড়ে ফেলো।'

রানা দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠে সুলতা বলল, 'তোমার মুখে এত কাটাকুটি কেন? রক্ত বেয়ে পড়ছে। এখন ডেটল কোথায় পাই বলো তো!' ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠল সুলতা।

'আমার সুটকেসে আফটার-শেভ লোশন আছে। বের করে দাও, তাই খানিকটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আর আমার স্লীপিং গাউনটাও বের করো, এক্ষুণি খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

একটা চেয়ারের উপর গাউন আর ওল্ড স্পাইসের শিশিটা বের করে রাখতেই একটা টার্কিশ টাওয়েল কাঁধে ফেলে ওগুলো তুলে নিতে গেল রানা।

'রাখো তো ওগুলো, আমি লাগিয়ে দেব,' বলে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে রানাকে বাথরুমের মধ্যে নিয়ে গেল সুলতা। 'কোথায় কোথায় লেগেছে দেখি?'

টী-শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেলল সুলতা আলতো হাতে। গেঞ্জিটা খুলে রানার দেহের দৃঢ় পেশীগুলোর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'বাব্বা, কী অসম্ভব জোর তোমার গায়ে। তিনজন গুণ্ডামার্কা লোকও পারল না তোমার সাথে! নাও, এখন মুখটা ধুয়ে ফেলো তো আগে!'

মুখ ধুতে গিয়ে ডান হাতের তালুতে পানি লাগতেই জ্বালা করে উঠল। কাটা জায়গাটা দেখে আঁতকে উঠল সুলতা। কাঁচা দগদগে জখম থেকে তখনও রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। নীল হয়ে আছে দু'পাশের জায়গাটা। খানিকটা লোশন ঢেলে দিতেই কড়ে আঙুলটা কাটা মুরগীর মত লাফিয়ে উঠল কয়েকবার আপনাআপনি। জ্বালার চোটে কাতরে উঠল রানা। নিজের একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল সুলতা হাতটা। তারপর তোয়ালেটা পানিতে ভিজিয়ে মুছে নিয়ে মুখে, ঘাড়ে, পিঠে আর বাম কনুইয়ে লোশন লাগিয়ে দিল। রানার ভাল লাগল এই সেবা।

'আমার জন্যেই তোমার এই অবস্থা!' সুলতা নিজেকে অপরাধী মনে করছে।

দেহের উপরের ভাগটায় লোশন লাগানো হয়ে গেল। সুলতা জিজ্ঞেস করল, 'পায়ে-টায়ে কেটেছে কোথাও?'

'মনে হয় না।'

'তাহলে চলো, খেয়ে নাও ঘরে এসে।'

'তুমি যাও আমি কাপড়টা ছেড়েই আসছি।'

সাত কোর্সের ডিনার রাখা আছে টেবিলে। কিন্তু সবই ঠাণ্ডা। এক নজর দেখেই খাবার রুচি নষ্ট হয়ে গেল রানার। একজোড়া চিংড়ীর কাটলেটের মাঝখানে খানিকটা টম্যাটো সস্ ঢেলে নিয়ে নাক-মুখ বুঁজে কোন মতে খেয়ে নিল সে।

'আচ্ছা, বলতে পারো, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কারা?'

'কবীর চৌধুরীর ভাড়া করা গুণ্ডা।' এক গ্লাস পানি খেয়ে ঠক করে টেবিলের উপর গ্লাস রেখে জবাব দিল রানা।

'কিন্তু, কারণ কি?'

'কারণ তোমার রূপ। মনে ধরে গিয়েছিল ওর।'

'তাই নাকি?' হাসল সুলতা। 'কিন্তু লোকটাকে দেখে তো এমন বলে মনে হয়নি!'

'কেবল দেখে সবাইকে কি চেনা যায়? আমাকেই বা তুমি কতটুকু চিনেছ?'

কথাটা নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভাবল সুলতা, তারপর বলল, 'তা তুমি হঠাৎ কোত্থেকে এলে? কোথায় গিয়েছিলে বাইরে? মনে হলো যেন আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

'একা-একা ভাল লাগছিল না, বেরিয়ে পড়েছিলাম বাইরে। একটা নাইট শোতে ঢুকেছিলাম, ভাল লাগল না—কিছুদূর দেখে হাফ টাইমের সময় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিলাম।'

'জানো, আমি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় পড়িনি। তুমি এসে না পড়লে কী যে হোত ভাবতেই শিউরে উঠছি।'

'কিন্তু ঘরে ঢুকল কি করে ওরা? দরজার ছিটকিনি লাগাওনি?'

'লাগিয়েছিলাম।'

রানা উঠে গিয়ে দেখল চৌকাঠের একটা ফাঁক দিয়ে অনায়াসেই ছিটকিনি খোলা যায়। নাহ্, আজ আর ঘুম নেই কপালে, জেগেই কাটাতে হবে রাতটা।

পশ্চিমের জানালাটা খুলে দিয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে পাশে এল সুলতা। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো এসে পড়ল ওদের চোখে মুখে।

ঘুমিয়ে পড়েছে শহর। মাঝে মাঝে এক আধটা হর্ন শোনা যাচ্ছে নাইট-ক্লাব ফেরতা ভদ্রলোকদের গাড়ির। তাছাড়া নিঝুম। কাছেই কোন বাড়িতে বাচ্চা কেঁদে উঠল একটা। আবার চুপ। মিটমিট করছে তারাগুলো। উজ্জ্বল চাঁদের পাশে নিষ্প্রভ লাগছে ওদের।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল সুলতা।

'কিছু না।'

'কিছুই না?'

'ভাবছি, কত লক্ষ কোটি বছর ধরে মিটমিট করছে ওই তারাগুলো। ওদের পাশে আমাদের জীবন কত নগণ্য!'

দূর থেকে একটা জাহাজের বাঁশি বেজে উঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল এ-বাড়ি ও-বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে। আবার সব চুপ।

অনেক গল্প হলো। কথায় কথায় রানা বুঝতে পারল কলকাতা অফিস থেকে কতগুলো শব্দই কেবল মুখস্থ করিয়ে দেয়া হয়েছে সুলতাকে। ডিনামাইটগুলো

কোথায় ফাটানো হবে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই ওর। কি ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে ওকে কোন আভাস দেয়া হয়নি।

'সারাদিন অনেক ধকল গেছে,' বলল রানা, 'যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

'আর তুমি?'

'তিনটে পর্যন্ত পাহারা দেব, তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি ঘুমাব বাকি রাত।'

'ঠিক আছে,' বলে একটা হাই তুলল সুলতা, তারপর উঠে পড়ল বিছানায়।

সারা রাত জাগতে হবে আজ রানাকে। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে। কাপড়ের ভাঁজে সযত্নে রাখা সাইলেন্সারটা বের করল সুটকেস থেকে, রাখল টেবিলের উপর। তারপর ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল।

ঘুমে আর ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীরটা। একটা বেন্সেড্রিন ট্যাবলেট মুখে ফেলে এক ঢোক পানির সাথে গিলে ফেলল রানা। তারপর গা এলিয়ে দিল ইজিচেয়ারে।

ঘুমন্ত সুলতার একটানা ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ আর রিস্টওয়াচের একঘেঁয়ে টিকটিক করে বেজে যাওয়া। এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। অনেক কথা মনে এল রানার। অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি। জীবনের কত ছোট-খাটো সাধারণ কথা কোন্ ফাঁকে স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে গেছে। মণিমুক্তোর মত অমূল্য মনে হচ্ছে সেগুলোকে এখন। বড় বিচিত্র মানুষের মন। দূরে কোথাও ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজল তিনবার। তিনটে বাজে।

ঘুমের ঘোরে সুলতাকে বিড় বিড় করে কিছু বলতে শুনে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কিছুই বোঝা গেল না অস্পষ্ট এক আধটা অর্থহীন শব্দ ছাড়া। একটু হেসে টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে আধ গ্লাস পানি দুই ঢোকে শেষ করল রানা, তারপর পশ্চিমের জানালাটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ডুবে যাচ্ছে চাঁদ। নিষ্প্রভ হলদেটে দেখাচ্ছে ওটাকে। সেই ম্লান আলোয় হঠাৎ রানার নজরে পড়ল, দু'জন লোক উপরে উঠে আসছে ছাদের ট্যাঙ্কে পানি তুলবার পাইপ বেয়ে।

মৃদু হাসল রানা। এবারের আক্রমণটা তাহলে এই পথে আসছে!

উপরের দিকে না চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে সন্তর্পণে উঠে আসছে লোকগুলো। টেবিলের উপর থেকে সাইলেন্সারটা এনে ধীরেসুস্থে পেঁচিয়ে লাগাল রানা পিস্তলের মুখে। পাঁচ-ছয় হাত বাকি থাকতে প্রথম লোকটা দেখতে পেল রানাকে। কিন্তু বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছে তখন। টুথপেস্টের টিউব থেকে বুদ্বুদ বেরিয়ে যেমন শব্দ হয় তেমনি 'ফট' করে একটা শব্দ বেরোল রানার ওয়ালথার থেকে। লোকটা তার সঙ্গীর উপর গিয়ে পড়ল পাইপ ছেড়ে দিয়ে। আচমকা আঘাতে সে-ও তাল সামলাতে পারল না। দু'জন একই সাথে দ্রুত নেমে গেল নিচে। ঠিক চার সেকেণ্ড পর পশ্চিম দিকের আবর্জনাময় সরু সুইপার প্যাসেজে ভারি কিছু পতনের শব্দ হলো।

খালি বিছানাটায় শুয়ে পড়ল রানা এবার। বালিশের তলায় পিস্তল রেখে সেটার বাঁটের উপর ডান হাতটা রাখল সে অভ্যাস মত। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে।

ছয়

কিন্তু অতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া উচিত হয়নি রানার। জেগে থাকলে পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার দিকে আস্তে খুট করে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দটা শুনতে সে পেতই। কবীর চৌধুরীকে ভয়ঙ্কর লোক হিসেবে সে চিনেছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে যে কতখানি দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি।

ঘুম ভাঙল রানার সকাল আটটায়। সুলতা অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে চান-টান করে আপন মনে সারা ঘরময় গুনগুন করে বেড়াচ্ছে। এটা ওটা গুছিয়ে রাখছে নিপুণ হাতে। চুপচাপ শুয়ে শুয়ে তাই দেখছিল রানা। হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল সুলতা, তারপর ভ্রূকুটি করল।

একটু হেসে উঠে বসল রানা। সুটকেস থেকে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান আর কাপড় বের করে দিল সুলতা। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে খুশি মনে শিস দিতে দিতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। বাথরুমের দরজায় ভিতর থেকে আর ছিটকিনি লাগাল না।

বাথটাবের কলটা খুলে দিয়ে বেসিনের সামনে দাঁত মেজে নিল রানা। আরও দু-একটা কাজ সেরে নিয়ে স্লীপিং গাউনটা খুলে দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে রাখল ঝুলিয়ে। বাথটাব প্রায় ভরে এসেছে—দু'মিনিট অপেক্ষা করে কল বন্ধ করে দিল রানা। তারপর সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় নেমে পড়ল টাবের ভিতর।

মস্ত বড় বাথটাবটা মসৃণ পিচ্ছিল সাদা পাথরে তৈরি—ইচ্ছে করলে তার মধ্যে সাঁতার কাটা যায়। অকারণ পুলকে রানার গায়ে কাঁটা দিল। ধীরে ধীরে গা-হাত-পা ঘষতে ঘষতে গতরাতের ঘটনাগুলো মনে মনে উল্টে-পাল্টে দেখছে সে।

হঠাৎ পিছনের পর্দাটা কেঁপে উঠল। সামনের দেয়ালে একটা ছায়া নড়ল, আবছামত। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা উদ্যত ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াকুব। দ্রুত উঠবার চেষ্টা করল সে বাথটাব থেকে—কিন্তু পিছলে গেল হাত। তাছাড়া দেরিও হয়ে গিয়েছে। ভোর সাড়ে-পাঁচটা থেকে বাথরুমের মধ্যে পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছে ইয়াকুব, সুযোগ বুঝে এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল সে। তারপর এক হাতে রানার চুলের মুঠি ধরে চেপে রাখল মাথাটা পানির তলায়।

চোখ বন্ধ করে রানা আশা করল এবার ছুরিটা আমূল ঢুকে যাবে ওর বুকের ভিতর। পানির নিচে টুঁ শব্দ করতে পারবে না সে। লাল হয়ে যাবে বাথটাবের পানি, নিঃশব্দে কয়েক সেকেণ্ড ছটফট করে মৃত্যু হবে তার। ছুরিটা যখন বিঁধবে, খুব বেশি কষ্ট হবে কি?

তিন-চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করবার পরও যখন তার বুকটা অক্ষত রইল তখন চোখ মেলে দেখল রানা, ছুরিটা হাতে ধরাই আছে—সেটা ব্যবহারের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই ইয়াকুবের। ঠিকই তো, যখন নিঃশব্দে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সারতে পারছে, তখন ছুরি-ছোরার কি দরকার?

দুই হাতে প্রাণপণে চেষ্টা করল রানা চুলের মুঠি ছাড়াবার। আরও শক্ত করে এঁটে বসল হাতটা—একটুও আলগা হলো না সে মুঠি। ছটফট করতে থাকল রানা একটু দম নেবার জন্যে। মনে হলো বুকের ছাতিটা ফেটে যাবে বুঝি।

পিঠের উপর ভর করে পা দুটো উপর দিকে উঠিয়ে বাথটাবের কিনারায় বাধাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু সেয়ানা ইয়াকুব তখন চুল ধরে টেনে ওর পিঠটা আলগা করে দেয়—পিঠের নিচে শক্ত কিছু না থাকায় ঝপাৎ করে পা-দুটো পড়ে যায় আবার টাবের মধ্যে।

প্রায় এক মিনিট ধরে একের পর এক নানান কৌশলে বাঁচার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বিফল হলো প্রতিবারই। পিচ্ছিল বাথটাব থেকে কিছুতেই মুক্তি পেল না সে। ঝিমিয়ে এল ক্রমে ওর দেহটা।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল যে সে মারা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নিরুপায় ও এখন। এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই—বৃথাই চেষ্টা করা। মাথার কাছের লোকটা আসলে ইয়াকুব নয়, স্বয়ং যমদূত আজরাইল। মনে পড়ল জ্যোতিষী বলেছিল, আটাত্ন বছর পর্যন্ত ওর আয়ু। এইবার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র ভুল, কিন্তু এই সত্যটা প্রমাণ করবার উপায় নেই—ও তো মরেই যাচ্ছে। প্রমাণ করবে কে? হাসি পেল রানার।

চোখ খুলে দেখল পানির উপর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে। ঝকঝক করছে সাদা দাঁতগুলো; ছোট ছোট ঢেউয়ে দুলছে এলোমেলো ভাবে।

ছোট একটা সরু শিকলে পা ঠেকল রানার। বুঝল, বাথটাবের পানি বেরোবার রাস্তাটা যে রাবারের প্লাগ দিয়ে আটকানো আছে, এ শিকল তারই সাথে লাগানো। আস্তে করে শিকলটা পা দিয়ে সরিয়ে দিলেই প্লাগ খুলে পানি বেরিয়ে যাবে টাব থেকে। কিন্তু অবসন্ন হয়ে গেছে রানার শরীর। একবার চেষ্টাও করল সে শিকলটা সরাবার, কিন্তু পা নড়ল না একটুও। মস্তিষ্কের হুকুম স্নায়ুগুলো আর বয়ে নিয়ে যেতে পারছে না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছে রানা।

শেষ বারের মত রানা চাইল উপর দিকে। তেমনি জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। হঠাৎ তিনটে চোখ দেখতে পেল রানা। দুটো চোখের ঠিক মাঝখানটায় যেন আরেকটা চোখ দেখা যাচ্ছে। চুলের মুঠি আলগা হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল অসহায় মাসুদ রানা।

রানা বাথরুমে গিয়ে ঢুকতেই সুলতা এগিয়ে গেল রানার এলোমেলো বিছানাটার দিকে। বালিশ সরাতেই সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা দেখল সে। চাদর সাট করে আবার বালিশের তলায় রেখে দিল সে পিস্তলটা যত্নের সাথে আঁচল দিয়ে মুছে। সুবীরের জিনিস বলে পিস্তলটাকেও আদর করতে ইচ্ছে করছে ওর।

বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেল। একটা সিনেমা পত্রিকা নিয়ে ছবিগুলোর উপর আনমনে চোখ বুলিয়ে গেল সে। নিচের ক্যাপশনগুলো পর্যন্ত পড়ল না। কিছুতেই মন বসছে না কোন কাজে। মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যার তাজা খবর বেরিয়েছে সদ্য, সেই সাথে তার জীবনী। সেটাতেও মন বসল না। হলো কি ওর? উল্টাতে উল্টাতে যখন শেষ হয়ে গেল সব ক'টা পাতা তখন ঝপাৎ করে টেবিলের উপর পত্রিকাটা চিৎ

করে ফেলে উঠে দাঁড়াল সুলতা। বেরোচ্ছে না কেন সুবীর এখনও? সে-ই বা এত অস্থির হচ্ছে কেন লোকটার জন্যে, ভেবে লজ্জা পেল ও।

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবার। বাইরে বেশ রোদ উঠেছে। সারি সারি একতলা, দোতলা, তেতলা বাড়িগুলোর ছাতের উপর বিছিয়ে পড়েছে সে রোদ। দৈনন্দিন হট্টগোলে লিপ্ত হয়েছে কর্মব্যস্ত চট্টগ্রাম বন্দর। এই আবছা কোলাহল নিরালায় বসে কান পেতে শুনলে উদাস হয়ে যায় মন।

হঠাৎ নিচের দিকে চোখ পড়তেই দেখল সুলতা দু'জন লোক পড়ে আছে গলির মধ্যে। বোধহয় মৃত। পাশে জটলা করছে কয়েকজন লোক। একজন তাদের মধ্যে সাদা পোশাক পরা, আর বাকি ক'জন খাকি পোশাক পরা পুলিসের লোক।

দৌড়ে এসে বাথরুমের সামনে দাঁড়াল সুলতা। কয়েকবার ডাকল, 'শুনছ, এই শুনছ?' ভিতর থেকে কোন জবাব এল না। আবার ডাকল। কোন জবাব নেই। কি মনে করে চাবির গর্তে চোখ রাখল সে। ফুটো দিয়ে দেখল, অপরিচিত এক লোক উবু হয়ে বসে আছে বাথটাবের মাথার কাছে। এক হাতে মস্ত এক ছুরি, আর অপর হাতে পানির মধ্যে কি যেন ঠেসে ধরে আছে।

মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল সুলতার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা। হত্যা করা হচ্ছে সুবীরকে। ছুটে গিয়ে পিস্তলটা নিয়ে এল সে বালিশের তলা থেকে। বাথরুমের দরজার হাতল ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা। ধাক্কা দিয়ে হাঁ করে দিল কপাট, তারপর লোকটার বুক লক্ষ্য করে টিপে দিল ট্রিগার।

সোজা গিয়ে গুলি লাগল লোকটার কপালে—দুই চোখের ঠিক মাঝখানটায়। দ্বিতীয় গুলির আর প্রয়োজন হলো না। গভীর ক্ষতস্থলটা দেখতে হলো ঠিক শিবের তৃতীয় নেত্রের মত। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। পড়ে গেল লোকটা মেঝের উপর। কলকল করে লাল রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে ড্রেনের দিকে।

বহুকষ্টে রানাকে টেনে বের করল সুলতা বাথটাব থেকে। পরিশ্রম আর উত্তেজনায় নিজেই হাঁপাচ্ছে সে, তাই ঠিক বুঝতে পারল না নাড়ী চলছে কিনা। ফার্স্ট এইড কোর্স কমপ্লিট করাই ছিল—আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন দিতে আরম্ভ করল সে রানার মুখে মুখ লাগিয়ে, আর পাঁজরের দু'পাশে দু'হাতে চাপ দিয়ে।

ঠিক এমনি সময় দমাদম ধাক্কা আরম্ভ হলো দরজায়। ভয়ে পাংশু হয়ে গেল সুলতার মুখ। হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করল তার। নিশ্চয়ই পুলিস এসেছে। বাথরুমে রক্তারক্তি কাণ্ড—নিচে মৃতদেহ—এদিকে সুবীর জ্যান্ত না শেষ ঈশ্বরই জানেন! পাকিস্তানে এসে এবার হাতকড়া পড়ল ওর হাতে। জল বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে। চোখটা মুছে নিয়ে মন শক্ত করবার চেষ্টা করল ও। ভাবল, যে ক'জনকে পারি গুলি করে মেরে তারপর ধরা দেব। পিস্তলটা হাতে তুলে নিল সুলতা।

দরজায় করাঘাতের শব্দ বেড়েই চলল। সেই সাথে শোনা গেল কয়েকজন লোকের হাঁক-ডাক। ঠিক সেই সময়ে একটু নড়ে উঠল রানার দেহ। আশার আলো দেখতে পেল সুলতা। সুবীরের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলে নিশ্চয় এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। এই অল্প পরিচয়েই বুঝতে পেরেছে সুলতা, এই অদ্ভুত বেপরোয়া লোকটার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়।

বার কয়েক জোরে জোরে ঝাঁকি দিতেই লাল চোখ মেলে চাইল রানা। আধ মিনিট ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল সে, ঘাড়টা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক চাইল কয়েকবার, তারপর মনে হলো ধীরে ধীরে যেন বুঝতে পারছে ও সবকিছু।

কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিল দরজার ওপাশের লোকগুলো, হঠাৎ দরজার ছিটকিনি খুলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল এবার ঘরের মধ্যে। নিচের সেই সাদা পোশাক পরা লোকটা সবার আগে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই হাতের ডান ধারে পড়ল খোলা বাথরূম।

মরিয়া হয়ে পিস্তল তুলল সুলতা। গুলিটা বেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে এক ঠেলায় সুলতার হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল রানা। তারপর কেড়ে নিল পিস্তলটা ওর হাত থেকে। ছুটে যাওয়া গুলিটা ছাতে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে টুপ করে পড়ল সুলতার কোলের উপর। হতভম্ব সুলতা হাঁ করে রানার মুখের দিকে দুই সেকেণ্ড চেয়ে থেকে ফিস ফিস করে বলল, 'পুলিস!'

'কি ব্যাপার, সুবীর বাবু! একি দশা আপনার? খুন হয়ে পড়ে রয়েছে কে?' প্রশ্ন করল পি.সি.আই-এর চিটাগাং এজেন্ট আবদুল হাই এক সেকেণ্ডে অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠে।

প্রথমে রানা চেয়ে দেখল ইয়াকুবের লম্বা দেহটা। কুঁকড়ে পড়ে আছে সে মাটিতে—এখনও রক্ত বেরোচ্ছে কপাল থেকে। তারপর নিজের নগ্ন দেহের দিকে নজর যেতেই সংবিৎ ফিরে পেল সে। একটানে র‍্যাকেট থেকে তোয়ালেটা নিয়ে শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় জড়িয়ে নিল। তারপরই আবার মাথাটা ঘুরে উঠে চোখ আঁধার হয়ে এল। 'আমাকে ধরুন···' বলেই পড়ে যাচ্ছিল সে মেঝের উপর, লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ধরে ফেলল ওকে আবদুল হাই।

একজন সেপাইয়ের সাহায্যে রানাকে ওর বিছানায় এনে শোয়ানো হলো। নিচের 'বার' থেকে আউন্স দুয়েক ব্র্যাণ্ডি এনে খাওয়ানো হলো। সিপাইদের ঘরের বাইরে দাঁড়াতে বলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আবদুল হাই শুনে নিল আদ্যোপান্ত ঘটনাটা সুলতাকে প্রশ্ন করে করে। তারপর বাইরে দাঁড়ানো সাব-ইন্সপেক্টারকে কিছু বলল নিচু গলায়। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা মোটা ক্যানভাসের বড় থলের মধ্যে মৃতদেহটাকে ভরে নিয়ে বাথরূমের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে চলে গেল সিপাইরা—যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে।

রানাকে চোখ মেলতে দেখে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবদুল হাই সুলতাকে বলল, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, সুলতা দেবী। আমার নাম পুলক ব্যানার্জী। খাকি ড্রেস পরা ওই লোকগুলো আমাদেরই লোক। সরিয়ে ফেললাম লাশটা কারও টের পাবার আগেই। কিন্তু আর একটু হলেই তো আপনি সেম-সাইড করে ফেলছিলেন, সুলতা দেবী। আমার তো আত্মাটাই চমকে গিয়েছিল একেবারে!'

'আমি কি করে বুঝব বলুন যে আপনি পাকিস্তানী পুলিসের লোক নন?' একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলল সুলতা।

'তা অবশ্যি ঠিকই বলেছেন। আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও বোধহয় তাই করতাম। যাক, ভাগ্যিস ঠিক সময় মত সুবীর বাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছিল! যা সই আপনার হাতের; নির্ঘাৎ কপালে লাগত গুলিটা!'

'যাহ্, সই না আরও কিছু! ভয়ে এমন কাঁপছিল হাতটা—গুলি করলাম হার্ট লক্ষ্য

করে, ছুটে লাগল গিয়ে কপালে।'

হো-হো করে হেসে উঠল আবদুল হাই। রানাও যোগ দিল হাসিতে। বলল, 'ভালই সই বলতে হবে। যাক, এখন কলিং বেলটা টিপে দাও তো, কিছু খেয়ে নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব আমি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' বেলটা টিপে দিয়ে জিজ্ঞেস করল সুলতা।

'কাপ্তাই।'

'কাপ্তাই কেন?'

'কাজ আছে।'

'অসুস্থ শরীর নিয়ে আজ না গেলেই কি নয়?'

আবদুল হাই মুখ টিপে হাসল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রানা বলল, 'না, যেতেই হবে।'

'আর আমি?'

'তুমি ইচ্ছে করলে যেতে পারো আমার সঙ্গে। ইচ্ছে করলে পুলক বাবুর সাথে ঘুরে ফিরে দেখতে পারো চিটাগাং শহর।'

'আমি তোমার সাথেই যাব।'

'গেলে জলদি কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও।'

সুলতা যেই কাপড় ছাড়তে বাথরুমে ঢুকল, অমনি ইশারায় হাইকে কাছে ডাকল রানা। বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল হাই।

'কবীর চৌধুরীকে চেনেন? ২৫৭ নম্বর বায়েজিত বোস্তামী রোডে ওর বাসা।'

'চিনি মানে? খুব ভাল করে চিনি।'

'ওর সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে বলুন।'

'তিনিই তো চৌধুরী জুয়েলার্সের মালিক। অজস্র টাকা। খুবই বিনয়ী ভদ্রলোক। তেমনি আবার দান খয়রাতে দরাজ হাত। এমন লোক হয় না। বহু দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল আর কলেজ ওঁরই টাকায় চলে। জনসাধারণের কাছে যেমন সুনাম আছে ওঁর, তেমনি আছে গভর্নমেন্ট অফিসের উঁচু সার্কেলে দহরম-মহরম। প্রথম দিকে প্রায়ই ঢাকা-করাচী-লাহোর, এমন কি নিউইয়র্ক-লণ্ডন-মস্কো পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করেছেন, এখন চিটাগাং-এর বাইরে বড় বেশি যান না। কি ব্যাপার! হঠাৎ এঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন যে?'

'এই কবীর চৌধুরীই আমাদের টার্গেট। একটু আগে যে সব লোককে পাচার করলেন থলেয় ভরে তারা ওরই অনুচর।'

হাঁ হয়ে গেল আবদুল হাইয়ের মুখটা।

'বলেন কি, মশাই?'

'মশাই নয়, সাহেব; কিন্তু যা বলছি ঠিকই বলছি। ভারতীয় ডিনামাইটগুলো ওরই কাছে পৌছে দেয়া হয়েছে কাল রাতে। আমার উপর আক্রমণের বহর দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাকে চিনে ফেলেছে। ও-ই যে আসল লোক, এতক্ষণ সেটা জানতাম একা আমি, এখন আপনিও জানলেন। কাজেই আমারই মত আপনার মাথার ওপরেও এই মুহূর্ত থেকে ঝুলল ওর মৃত্যু পরোয়ানা।'

'আশ্চর্য কথা শোনালেন আপনি!'

'বিস্মিত হবেন না, মি. হাই। দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ···ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন কাজের কথায় আসা যাক। খুব সাবধানে নিজের গা বাঁচিয়ে ওর সম্পর্কে যতখানি সম্ভব তথ্য উদ্ধার করুন, আজই। আমার যতদূর বিশ্বাস, চিটাগাং-এর কাছাকাছি ওর আরেকটা আস্তানা আছে—সেখানে সে ল্যাবরেটরি করেছে একটা। সে ব্যাপারেও একটু সন্ধান করবেন। কিন্তু সাবধান, চৌধুরীর বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবেন না, ওটা একটা দুর্গম দুর্গ। আর একটা কাজ আছে। আপনি পাহাড়তলী স্টেশনে গিয়ে সুলতার নামে একটা টেলিগ্রাম করবেন। টেলিগ্রামের নিচে প্রেরকের নাম থাকবে জেটিটি—লিখবেন, কবীর চৌধুরী শত্রু, যেন সে সুবীরের কথা মত চলে।'

'আপনি কাপ্তাই থেকে ফিরছেন কখন?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় বেলা চারটের মধ্যেই।'

'বেশ, আমি চললাম। এরই মধ্যে সব খবর বের করে ফেলার চেষ্টা করব। ওহহো, ভুলেই গিয়েছিলাম; কাপ্তাই থেকে সোজা আমার বাংলোতে চলে যাবেন। আপনাদের মালপত্র আমার ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি আমি। একটা চমৎকার ঘর আপনাদের জন্যে রেডি রাখা হবে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে আবদুল হাই বলল, 'এটা আমার অনুরোধ নয়, হেড অফিসের হুকুম। আমি চললাম। গুড বাই!'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল আবদুল হাই।

চিটাগাং থেকে কাপ্তাই পঁয়ত্রিশ মাইল। অতি চমৎকার রাস্তা। মোড় ঘুরবার সময় রাস্তার সুপার এলিভেশন এত সুন্দর যে যেখানে স্পীড লিমিট টেন মাইলস লেখা, সেখানেও পঞ্চাশ-ষাট মাইল বেগে অনায়াসে 'ইউ' টার্ন নেয়া যায়। পথে পাঁচটা চেক-পোস্ট।

এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ভোল্টের গ্রিড সাব-স্টেশন দেখা গেল রেলগেট পার হয়ে কিছুদূর যেতেই হাতের বাঁয়ে। বিটকেল চেহারার সব যন্ত্রপাতি, কাঁটাতার দিয়ে এলাকাটা ঘেরা।

দু'পাশে উঁচু টিলা—মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর দিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা মসৃণ পথ। চন্দ্রঘোনা পার হয়ে কর্ণফুলীর পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ে অপূর্ব সুন্দর সব দৃশ্য! নদীর অপর পারেই উঁচু পাহাড়। লম্বা লম্বা গাছ আর ছোট আগাছায় ভর্তি সেগুলো, শহুরে মনকে টানে অন্য এক অচঞ্চল সাদামাঠা জীবনের প্রতি, নীরব ইঙ্গিতে। চারদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়।

হঠাৎ একটা সামান্য ব্যাপার চোখে পড়ল রানার। রাস্তার পাশে টেলিফোনের তার এতক্ষণ ছিল চারটে, নতুন চকচকে একটা তার রোদে ঝিক্‌মিক্ করছে বলে রানা লক্ষ করল তার এখন দেখা যাচ্ছে পাঁচটা। রানা মোটেই আশ্চর্য হয়নি প্রথমে, কিন্তু অবাক হলো কাপ্তাইয়ের শেষ চেক-পোস্টটা পার হবার পর যখন দেখল তার আবার চারটেই দেখা যাচ্ছে—পঞ্চমটা নেই।

ভি.আই.পি. রেস্ট হাউসে একটা কামরা বুক করে সুলতাকে সেখানে রেখে সোজা মি. লারসেনের অফিসে গিয়ে উঠল রানা। পরিচয় পেয়ে সাদর অভ্যর্থনা

জানালেন তিনি। তিনিই পি.সি.আই-এর সাহায্য চেয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন ডিফেন্স সেক্রেটারির কাছে। আবদুলকে ডাকিয়ে এনে বাইরে দাঁড়ানো দারোয়ানকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ঘরের সব দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন তিনি।

সংক্ষেপে সেদিন সন্ধ্যার ঘটনাগুলো বললেন মি. লারসেন। তারপর বললেন, 'সেদিন আমি ইসলামের মাছের গল্পে ভুললেও আবদুলের তীক্ষ্ণ চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। বাংলোয় ফেরার পথে ও আমাকে চার্জ করল ইসলামকে পানিতে নামতে দেয়ায়, বলল লোকটাকে জ্যান্ত ধরে আনা যেত, ইসলাম যদি ওকে পানির তলায় খুন না করত। সব ব্যাপার চাপা দেয়ার জন্যে লোকটার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে সে, ভিতরে আরও কিছু ব্যাপার আছে—অ্যাও হি ওয়াজ রাইট! সেদিন রাতেই তারা দুই-দুইবার অ্যাটেম্প্ট নিয়েছে আবদুলের ওপর। খুব হুঁশিয়ার না থাকলে সে রাতেই শেষ হয়ে যেত আবদুল।—যাক, সে কথায় পরে আসা যাবে। আবদুলের অবিশ্বাস্য মন্তব্য মাথার মধ্যে এমন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে সে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। সকালে উঠেই হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলাম। লোকটা কিভাবে মারা গেছে জানেন? পটাশিয়াম সায়ানাইড। কেউ ইনজেক্ট করেছে ওর পিঠে। ইসলাম গায়েব—ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালে যাচ্ছি বলে সোজা চিটাগাং চলে গেছে।'

'ইসলামকে তুমি কেন সন্দেহ করলে, আবদুল?' আবদুলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল রানা। পানির নিচে মাঝপথে দেহটা আবদুলের হাতে ছিল, তাকেও তো খুনী হিসেবে সন্দেহ করা যেতে পারে।

'সেটা সাহেবকে বলেছি আমি, উনিই বলুন।' কথাটা বলতে বলতে একটা স্লিপ প্যাড থেকে ঘ্যাচ্ করে টান দিয়ে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে কিছু লিখল আবদুল, তারপর লারসেন সাহেবের চোখের সামনে ধরল লেখাটা।

লারসেন সাহেব ওটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, '১৯৬০ সালে যখন চ্যানেল ক্লোজ করা হলো তখন একটা ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পেয়ে যায়। UTAH এবং IECO আগে থেকে টের পেয়ে সাবধান না হলে (রানার চোখের সামনে কাগজটা ধরল এবার আবদুল। তাতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, 'সামবডি লিসেনিং!') আজ আর ড্যাম কমপ্লিট করতে হত না। অন্ততঃপক্ষে আরও পাঁচ বছরের জন্যে পিছিয়ে যেত কাজ। সেই ঘটনার পর আবদুল আমার সঙ্গে হাতী শিকারে গিয়ে এই ইসলামের ব্যাপারে সাবধান…'

বিড়ালের মত নিঃশব্দে ডানধারের একটা দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল আবদুল। এক ঝটকায় দরজাটা খুলেই কলার ধরে ভিতরে টেনে আনল একটা লোককে। এত আচমকা ঘটল ব্যাপারটা যে প্রথমে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল লোকটা। কান পেতে ঘরের কথাবার্তা শুনছিল সে নিবিষ্ট চিত্তে, হঠাৎ এমন বাঘের থাবা এসে পড়বে কে ভাবতে পেরেছিল! কিন্তু চট করে সামলে নিয়ে এক ঝটকায় আবদুলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে রানা, লারসেন দু'জনেই এগিয়ে এসেছে। লোকটাকে ধরে পিছমোড়া করে হাত দুটো বেঁধে ফেলা হলো। অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল না কিছুই।

লারসেন সাহেব থানায় ফোন করে রানার দিকে ফিরে বললেন, 'এ হচ্ছে

আমাদের ডিসপ্যাচ ক্লার্ক মতিন।' এর সম্বন্ধেও আবদুল আমাকে সাবধান করেছিল, আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা।'

কয়েকটা প্রশ্ন করেই বোঝা গেল কোন কথাই বেরোবে না মতিনের পেট থেকে। পরিষ্কার বলে দিল মতিন, 'নিশ্চিত মৃত্যুর চাইতে জেলের ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল। একটা কথাও বের করতে পারবেন না আমার কাছ থেকে, যত অত্যাচারই করেন না কেন।'

রানা ভাবল—কথা তোমাকে বলতেই হবে বাছাধন। স্কোপালামিন ট্রুথ সেরাম ইনজেকশন পড়লেই মুখে খৈ ফুটবে। কিন্তু কিছুই বলল না সে। মৃদু হেসে মি. লারসেনকে বলল, 'চিটাগাং এসেছিলাম অন্য কাজে, এখন দেখছি এক মহা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। যাক, আমি সেদিন সন্ধ্যার সেই জায়গাটা একবার সরেজমিনে দেখতে চাই।'

'চলুন, আপনাকে বোটে করে নিয়ে গিয়ে দেখাব।'

ও.সি.-কে আড়ালে ডেকে কিছু বলল রানা, নিজের আইডেন্টিটি কার্ডও দেখাল, তারপর ফোক্সওয়াগেনের দরজাটা খুলল, ভুরুজোড়া একটু কোঁচকাল, তারপর আবার কি মনে করে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে লারসেন সাহেবকে বলল, 'চলুন, আপনার গাড়িতেই যাই, কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন।' ভিতর থেকে পাশের দরজাটা খুলে দিলেন লারসেন।

'আচ্ছা, কালই তো প্রেসিডেন্ট আসছেন, তাই না?' রানা মুখে বলল এই কথা, কিন্তু মনে মনে ভ্রুকুটি করে চিন্তা করল, ফোক্সওয়াগেনের দরজাটা আলগা থাকবার তো কথা নয়! তারপর ভুলে গেল সে কথা।

'হ্যাঁ, লঞ্চঘাটে যাবার সময়ই দেখবেন মাঠের মধ্যে কী সুন্দর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নানান রঙের বাল্‌ব্ দিয়ে সাজানো হয়েছে স্টেজটাকে। পাকিস্তান আর ইউ.এস.এ-র পতাকা আঁকা হয়েছে; বন্ধুত্বের এম্বলেম 'দুইহাত' আঁকা হয়েছে। সামনে অসংখ্য লোকের বসবার ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্টের সামনে টেবিলের ওপর একটা সুইচ থাকবে পাওয়ার হাউস থেকে কানেক্ট করা। বক্তৃতার পর সেই সুইচ টিপবেন প্রেসিডেন্ট—আর ঝলমল করে জ্বলে উঠবে সমস্ত বাতি। ওপেন হয়ে যাবে প্রজেক্ট। কী চমৎকার নাটকীয় হবে, তাই না?'

স্পীডবোটে উঠে আবদুল একমনে বকে যাচ্ছিল, 'আট বোচ্ছোর ধরে কাজ করছি আমি কাপ্তাইয়ে, হুজুর। আমি যোখোন কারাচী-হায়দ্রাবাদ ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসে কাজ করি, তোখোন হামার এক দোস্ত ছিল বাঙ্গালী—বাড়ি চিটাগাঁও। তার কাছে গোল্লো সুন্‌ছি—ষাট-সত্তর মঞ্জিল দালান আছে চিটাগাঁওয়ে হাজারে হাজার। ডাবল-ডেক ট্রাম চোলে বহোত চওড়া রাস্তায়। ভাবলাম এ শাহার দেখতে হোবে। যোখোন পারথোম আয়লাম, আদমীকে জিগাই, "ভাইয়া, ডাবল-ডেক ট্রাম চালতা কৌন রাস্তে মে?" কেউ কোথা বুঝে না, ট্রামই দেখে নাই কাভি, বোলে, "হামি জানে না।"

'হামি মনে কোরলাম কে' "হামি জানে না," দুসরা কোঈ গাড়ি হোগা। বার বার বলি, "না না, ডাবল-ডেক ট্রাম, ডাবল-ডেক ট্রাম।" ' হা-হা করে হাসল

কিছুক্ষণ আবদুল।

'ওয়াস্ট প্যাকিস্তানে দুই পোয়সাকে 'টাকা' বোলে। পারথোম যোখোন হোটেলে খেলাম, বিল হোল এক টাকা। হামি ভি খোদার কাছে হাজার শোকর গোজার কোরে দুই পোয়সা বের কোরে দিলাম। দেখি, হোটেলওয়ালা মারতে চায় দিল্লাগী দেখে।' আবার এক পেট হেসে নিল সে।

'কিন্তু এই পাহাড়ী লোগ বোড়ো ভাল, হুজুর। দাস রাকোম ট্রাইব আছে;—মগ, চাক্‌মা, পাঙকো, তিপরা, খেয়াঙ, কুকী, মোরাঙ, তুঙতুনিয়া, লুসাই—লুসাই হোলো সব কিশ্চান, বোড়ো মেহমান নেওয়াজী। বহোত কামলা পাওয়া যায় সিখানে। ''গুড বাই''-কে বোলে ''দাম তা কিঙ-তু,'' ''তুমহারা ক্যায়া নাম''-কে বোলে ''নামিঙ তু''...'

হঠাৎ রানার বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল আবদুল। বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল যেন রানার সর্বশরীরে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে ড্যামের দিকে। ব্ল্যাকবোর্ডে সুলতার আঁকা নক্সাটা পরিষ্কার ফুটে উঠল ওর চোখের সামনে। এই ছবি! এই ছবিই আঁকছিল সুলতা কবীর চৌধুরীর বাড়িতে ব্ল্যাকবোর্ডের উপর। মনে মনে তিনটে লাল চিহ্ন আঁকল রানা বাঁধের গায়ে। নিঃসন্দেহ হলো সে, যখন ঠিক বাম দিকের চিহ্নটার উপর এসে লারসেন সাহেব বললেন, 'এই সেই স্পট্।'

সাত

ফিরতি পথে রানার মাথার মধ্যে এত দ্রুত চিন্তা চলল যে গাড়ির মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিটা না থাকলে মি. লারসেন আর আবদুল বোধহয় স্পষ্ট শুনতে পেত সে চিন্তা। বিগত দুই দিনের ঘটনাগুলো এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে, এখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্ল্যান চলছে রানার উর্বর মস্তিষ্কে। তা হলে দাঁড়াল এই, ভারতীয় ডিনামাইট এই বাঁধের তলায় বসানো হয়ে গেছে। এখন কেবল ফায়ার করবার অপেক্ষা। ওগুলো খুঁজে বের করে ওঠাতে পারলে অকেজো করে দেয়া যেত। এখন প্রথম কাজ, ওগুলো উদ্ধার করা। তারপর চৌধুরীর আস্তানা বের করে ধরতে হবে ওকে। সহজে হাল ছাড়বার পাত্র কবীর চৌধুরী নয়। চারদিকে ছায়ার মত কাজ করছে ওর লোকজন। মস্ত বড় জাল বিস্তার করেছে সে কাপ্তাইয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে।—কিন্তু কবীর চৌধুরী বাঁধ ভাঙতে চাইছে কেন? মতলবটা কি ওর?

ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর এই কাপ্তাই। শান্ত সৌম্য একটা ভাব বিরাজ করছে এর অন্তরের গভীরে। রিজার্ভয়েরের থেকে বাঁশের চালান মাথার উপর দিয়ে রাস্তা পার করে মরা নদীতে নামিয়ে দেবার জন্যে ওভারহেড ক্রেন রয়েছে একটা। এ বাঁশ আসে উত্তর থেকে কর্ণফুলী পেপার মিলসের জন্যে। হাতের ডানদিকে ফিশারীর অফিস। সেই পথে গিয়ে আবার ডান দিকে মোড় ঘুরলেই পাওয়ার হাউস। এক লক্ষ বিশ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এখনকার এই নীরব পাওয়ার হাউস।

বাঁধ শুরু হবার আগেই সারি সারি অফিসারস্ কোয়ার্টার। বাঁধ পার হয়ে

রাস্তাটা ডানদিকে মোড় ঘুরেছে। নিচে নেমে গেলে বাঁয়ে ডাকবাংলো, ডানে পুলিসের ফাঁড়ি, তারপর আবার বাঁয়ে বাজার। আর বাঁধ থেকে মোড়টা না ঘুরে সোজা চলে গেলে স্পিলওয়ে—উদ্বৃত্ত পানি বের করে দেয়া হয় এখান দিয়ে।

মি. লারসেনের অফিসের সামনে অনেক লোকের ভিড় দেখা গেল দূর থেকে। ব্যাপার কি? দ্রুত চালিয়ে এনে কাছেই পার্ক করলেন মি. লারসেন—তিনজনই লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

তখনও আগুন সম্পূর্ণ নিভে যায়নি। ছিন্ন-ভিন্ন গদিগুলো পুড়ছে এখানে ওখানে। অফিসের সামনে দাঁড়ানো রানার ফোক্সওয়াগেনের ভগ্নাবশেষ এখন এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে আছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল মিনিট দশেক আগে এক প্রচণ্ড শব্দ শুনে অফিস থেকে সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে দেখে গাড়িটার এই অবস্থা। পেট্রল ট্যাঙ্কে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলছে। আশপাশে কেউ ছিল না তখন রাস্তায়—গাড়ির ভিতরেই বোধহয় ছিল বোমাটা।

কেউ টাইম-বম্ব দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে রানার গাড়ি।

অফিস কামরায় ফিরে এসে মি. লারসেন রানার দিকে চেয়ে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। লাল মুখ তাঁর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। প্রাণহীন হাসিটা মুখ-বিকৃতির মত দেখাল।

'আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল ওরা!'

'তা চেয়েছিল।' বিচলিত ভাবটা চেপে রাখল রানা।

'আমার গাড়িতে না গিয়ে যদি ওই গাড়িটায় উঠতেন, তাহলে?' আতঙ্ক কাটছে না বিহ্বল লারসেনের। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি রানার জন্যে।

'যা হবার তাই হত। এই নিয়েই আমাদের কারবার, মি. লারসেন। যদি আপনার মত করে ভাবতে যেতাম, তাহলে আজই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হত। একদিন হঠাৎ এভাবেই মৃত্যু ঘটবে আমার—কিন্তু এসব কথা যতখানি মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। এখন কাজের কথায় আসা যাক। আমি এই ড্যামের একটা ছবি আঁকব এবং তার গায়ে তিনটে চিহ্ন দেব। তার আগে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।' একটু থেমে মনে মনে গুছিয়ে নিল রানা কথাগুলো।

'একজন লোক খুব শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ্ দিয়ে ড্যামটা উড়িয়ে দিতে চায়।'

'কেন???' লারসেন সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন চোখ দুটো কপালে তুলে। অসাবধানে ধরা মোটা চুরুটটা পড়ে গেল হাত থেকে।

'তা আমি জানি না। টি.এন.টি. এসেছে তার কাছে আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন দেশ থেকে। আর আপনাদের কথা শুনে যতদূর বুঝলাম সেগুলো সে ইতিমধ্যেই জায়গা মত বসিয়ে দিয়েছে।'

'লিম্পেট মাইন?'

'আমার মনে হয় ও জিনিসটা জাহাজের জন্যেই উপযুক্ত। এখানে ওরা হাই এক্সপ্লোসিভ টি.এন.টি. ব্যবহার করছে। দূর থেকে রেডিয়ো ট্র্যান্সমিশনের সাহায্যে ফাটানো হবে ওগুলো।'

'মাই গুডনেস, কখন?' আবার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন মি. লারসেন।

'তা-ও আমার জানা নেই। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে ফাটাতে পারে। আমি এক সুযোগে ওদের নক্সাটা দেখে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলি। এই বাঁধ কতখানি লম্বা তা আমার জানা নেই। আমি শুধু হুবহু ছবিটা এঁকে লাল চিহ্ন দিয়ে দেব তিনটে জায়গায়। আপনি হিসেব করে ঠিক ঠিক জায়গাগুলো বের করে নিয়ে জনাদশেক বিশ্বস্ত ডুবুরী নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজাবেন সে জায়গা।'

'তা না হয় করলাম। কিন্তু পুলিসে খবর দিচ্ছেন না কেন? লোকটাকে ধরতে পারলেই তো সব গোলমাল চুকে যায়। জানেন এটা কতখানি সিরিয়াস ব্যাপার? এই ড্যাম এখন ভাঙলে—ওহ্, জেসাস! গোটা চিটাগাং শহর ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, মি. রানা, কত লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এর কাছে কি! একটা লোকও তো বাঁচবে না এই ভয়ঙ্কর বন্যার হাত থেকে!'

'সবই জানি। কিন্তু পুলিসকে জানিয়ে এখন কোন লাভ নেই। লোকটার আস্তানা কেউ জানে না। একটা গভীর চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠেছে এই বাঁধকে ঘিরে। আপনাকে বলেছিলাম, এক কাজে এসে এখানে অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি; কিন্তু এখন দেখছি দুটো ব্যাপারই এক। যাক, এখন একটা চক বা মোটা শিষের লাল-নীল পেন্সিল দিন, আমি মেঝেতে ছবিটা এঁকে দিয়ে যাই।'

বাম দিকের চিহ্নটা দেখে আবদুল বলল, 'এই জায়গাটাই তো আপনাকে এখন দেখিয়ে আনলাম! এখন সব কোথা আমি বুঝতে পারছি, হুজুর। মাঝখানের ওই লাল দাগটাতে হামি পরথম দিন ভুড়ভুড়ি দেখছিলাম!'

লারসেনের একান্ত অনুরোধে আজকের দিনের জন্যে তাঁর গাড়িটা ব্যবহার করতে রাজি হলো রানা। সোয়া একটা বাজে এখন। চাঁদি ফাটানো কড়া রোদ উঠেছে। লারসেনের এয়ার-কুলড্ ঠাণ্ডা অফিস থেকে বেরিয়ে এসেই অসম্ভব গরম লাগল রানার। চিটপিট্ করে উঠল পিঠটা। বিকেলের দিকে ঝড় উঠতে পারে।

দুপুরেই উঠল সে ঝড় সুলতার মনে।

'তোমার গাড়ি কি হলো?' সুলতা এগিয়ে এল রানাকে দেখে।

'টাইম্-বম্ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে কবীর চৌধুরী।'

সুলতা ভাবল, একটু আগে যে লোকটা এসেছিল সে তাহলে সত্যি কথাই বলেছে! সে অবশ্য বলেছিল মাসুদ রানাও ছাতু হয়ে যাবে সেই সঙ্গে।

'তোমার কিছু হয়নি?'

'আমি তখন এই গাড়িতে ছিলাম। কিন্তু কি ব্যাপার, সুলতা—তোমার চোখ-মুখ এমন মলিন কেন? কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে রানা।

'একটা কথা সত্যি করে বলবে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুলতার মুখের দিকে চেয়ে ওর মনের কথা অনেকখানি বুঝে ফেলল রানা। মৃদু হেসে বলল, 'বলব।'

'তোমার সত্যিকার পরিচয় কি?'

'আমি পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা।'

দুই হাতে নিজের দুই কান চেপে বন্ধ করল সুলতা। একথা সে শুনতে চায় না! একথা ও বিশ্বাস করে না! না, না, এ হতেই পারে না! এ হতেই পারে না! ও মাসুদ রানা নয়, ও সুবীর, আমার সুবীর!

'টেলিগ্রামটা দেখি।' গলাটা একটু ভেঙে আসে সুলতার।

পকেট থেকে বের করে দিল রানা টেলিগ্রাম। সুলতা পড়ল:

সেন হসপিটালাইযড্ অ্যাট ঢাকা স্টপ নেগোসিয়েশন ব্রোক ডাউন স্টপ ক্লোজ ডিল উইথ নিউ কোম্পানী স্টপ ফর সলভেনসি রেফার চৌধুরী।

কয়েকবার লেখাগুলোর উপর চোখ বুলাল সুলতা। ধীরে ধীরে অক্ষরগুলো এলোমেলো ঝাপসা হয়ে গেল। টপ-টপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল টেলিগ্রামটার উপর। তারপর ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কাগজটা জানালা দিয়ে বাইরে।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম···আমি, আমি ভেবেছিলাম···' একটু থামল সুলতা, 'বলো, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে কেন?' আহত সাপিনীর মত চাপা গর্জন করে উঠল সুলতা, 'বলো, কেন এইভাবে প্রতারণা করলে তুমি! ভাব দেখালে, ভালবাসো···'

'আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি, সুলতা। বরং তুমিই এসেছ আমার দেশের সর্বনাশ করতে। ভেবে দেখো।'

কিছু বোলো না সুলতা। কখনও কি স্বপ্নেও ভেবেছিল এতবড় আঘাত পাবে সে! যার সান্নিধ্যে এসে মনে হয়েছে ধন্য হলাম, পরিপূর্ণ হলাম—যাকে বিশ্বাস করলাম পরম নিশ্চিন্তে, সে বলছে, আমি অফিসের হুকুমে তোমার সাথে অভিনয় করেছি মাত্র। এখন নিশ্চয়ই তাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবে মাসুদ রানা। কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠল সুলতা। নয়া দিল্লীতে প্রথম যখন চাকরিতে যোগ দিল তখন থেকেই এই নাম শুনে আসছে সে। রানার নামে আলাদা একটা মোটা ফাইলে নিত্য নতুন রিপোর্ট সে নিজ হাতে গেঁথে রেখেছে। লাল ফিতে বাঁধা মোটা ফাইলটা এখনও চোখে ভাসে সুলতার। কতদিন পাতা উল্টিয়ে পড়েছে সে এর ভয়ঙ্কর, দুর্ধর্ষ, রোমহর্ষক কার্যকলাপের বিবরণ। অদ্ভুত কৌশলী, বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়চেতা এই যুবককে তাদের সার্ভিসের কে না ভীতির চোখে দেখে? আজ ভুল করে এরই মায়াজালে আটকে মরণ হবে সুলতার কে ভাবতে পেরেছিল?

রানারও খাওয়া হলো না কিছু। একটা সোফায় বসে চোখ বন্ধ করে মাথাটা এলিয়ে দিল সে পিছন দিকে। ভাবছে, এলো বিদায়ের পালা। কতটুকুই আর চিনি একে—কাল দুপুর থেকে আজ দুপুর—চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত যুগের পরিচয়, জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধুত্ব। একে বিদায় দিতে বুকটা আজ এমনি করে পুড়ছে কেন?

চোখ বন্ধ করেও মানুষ দেখতে পায়। অস্পষ্ট একটা ছায়া দেখে ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। দেখল তার কপাল থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে সুলতার হাতে ধরা অ্যাস্ট্রা পিস্তলটা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে।

'ধরা পড়বার আগে তোমাকে শেষ করে দিয়ে যাব, মাসুদ রানা। মৃত্যুর জন্যে

প্রস্তুত হয়ে নাও।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'আমি প্রস্তুত। মারো।'

'বাধা দেয়ার চেষ্টা করছ না কেন?' বিস্মিত হয় সুলতা।

'আমি দুর্বল, তাই।' হাসছে রানা।

কিছুক্ষণ সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করেও যখন ট্রিগার টিপতে পারল না সুলতা, তখন রানা বলল, 'সেফটি ক্যাচটা অফ করে নাও, তবে না গুলি বেরোবে!'

কয়েক মুহূর্ত পাগলের মত উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে রানার চোখে চোখে চেয়ে থেকে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সুলতা। তারপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আরও পাঁচ মিনিট কেটে গেল নীরবে।

'লতা,' মনটা স্থির করে ডাকল রানা।

'বলো।' নির্বিকার কণ্ঠ সুলতার।

'তোমার কাছে কেউ এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে দেয়ার কথা বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বেরিয়ে গেলেই আবার সে আসবে, তাই না?'

চুপ করে থাকল সুলতা। মৃদু হেসে রানা বলল, 'আজ বিদায়ের ক্ষণে অবিশ্বাস না-ই বা করলে, লতা।'

রানার কণ্ঠে এমন একটা আন্তরিক আকুতি ছিল যে ঘুরে দাঁড়াল বিস্মিত সুলতা, কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আসবে।'

'তুমি তার সাথে চলে যেয়ো, লতা। কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। তোমার সুটকেস যাতে তুমি ফিরে পাও সে ব্যবস্থাও আমি করব, কথা দিচ্ছি।'

'আমাকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর জেনেও ছেড়ে দেবে?' ঠিক বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না সুলতার।

'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব। তোমাকে আটকে রাখায় এদেশের কোন লাভ নেই। তোমার কাছে এমন কোন তথ্য নেই যাতে আমাদের কোন উপকার হতে পারে। তাই তোমাকে মুক্তি দেব। অবশ্য নিজের ইচ্ছে মত তোমাকে ছেড়ে দেয়ায় আমাকে জবাবদিহি করতে হবে—কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি চলে যাও, লতা। তোমাকে আমি নিরাপদে চলে যাওয়ার সুযোগ দেব।'

'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আর একটা ছোট্ট, সাধারণ অথচ অবিশ্বাস্য কথা বলব। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কথাটা মনে পড়লে হাসি আসবে তোমার। তোমার কাছে এর কোন মূল্য নেই বলেই হয়তো চিরকাল এটা অমূল্য হয়ে থাকবে আমার কাছে। তোমার ক্ষতি আমি চাই না, তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল, লতা। কথাটা বিশ্বাস কোরো।'

কথা শেষ করেই দ্রুত লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা ঘর থেকে, হঠাৎ জামার হাতায় টান পড়ল। ঘুরে দেখল সুলতা।

'যদি আমি না যাই?'

'যাবে না কেন?'

'কেন যাব! আমি তোমাকে ভালবেসেছি, রানা!' মাথাটা নিচু করল সুলতা একটু।

'সে তো সুবীর সেন মনে করে!'

'যদি বলি যাকে মন দিয়েছি তার নাম সুবীর হোক বা রানা হোক কিছুই এসে যায় না, মানুষটা সে একই—তবে তার পাশে চিরদিনের মত একটু স্থান পাব?'

'পাবে।'

'এক্ষুণি একবার থানায় আসতে পারবেন, মি. মাসুদ? আমি আতাউল হক, এস.পি. চিটাগাং, বলছি। আমি স্পেশাল ডিউটিতে কাপ্তাইয়ে আছি।' টেলিফোনে গলাটা একটু উত্তেজিত শোনাল।

এঁর সাথে আগে থেকেই পরিচয় আছে রানার। চিনতে পারল গলার স্বর এবং সিলেটি উচ্চারণ।

'আসতে পারি। কিন্তু ব্যাপার কি?'

'আপনার কথামত লোক পাঠিয়েছিলাম। সেই চক্চকে তারটার এই মাথায় একটা ক্যামেরা বসানো আছে। আশ্চর্য ব্যাপার! শিগগির চলে আসুন, নিজ চোখে দেখবেন।'

'আমি এক্ষুণি আসছি।'

'আরও একটা খবর, হ্যালো, হ্যালো···'

'বলুন, ধরেই আছি।' রিস্টওয়াচটা দেখল একবার রানা।

'কিছুক্ষণ আগে যাকে হ্যাণ্ডওভার করলেন ও.সি.-র কাছে, সেই মতিনকে মেরে ফেলেছে ওরা গুলি করে। থানায় এনে যেই জিপ থেকে নামানো হয়েছে অমনি একটা গুলি এসে লাগল একেবারে হৃৎপিণ্ডে। এক গুলিতেই শেষ। কোন আওয়াজ পাওয়া যায়নি গুলির। খুব সম্ভব সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল দিয়ে মেরেছে বহুদূর থেকে। আপনি গাড়ি নিয়ে একেবারে ভেতর চলে আসবেন দালানটা ঘুরে থানার পেছন দিক দিয়ে। গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থেকে নামবেন না। বুঝেছেন? রাখি, আপনি চলে আসেন।'

জেনারেল প্রিসিশন ইনক., ইউ.এস.এ.-র তৈরি শক্তিশালী সি.সি.টিভি. ক্যামেরা। একটা টিলার গায়ে জঙ্গলের মধ্যে বাঁধের দিকে মুখ করে বসানো। রোদ-বৃষ্টি থেকে আড়াল করবার জন্যে, এবং কিছুটা ক্যামোফ্লেজের উদ্দেশ্যে লেন্স ছাড়া বাকি সব সবুজ প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা।

'এ তারের আরেক মাথা কোথায় গেছে বের করা দরকার,' রানা বলল।

'জিপ দিয়ে অনেক আগেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। ঘন্টা খানেকের মধ্যে আশা করি ফিরে আসবে খবর নিয়ে,' আতাউল হক জবাব দিলেন।

'গোপনীয়তার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ। বলে দিয়েছি দূর থেকে দেখেই যেন ফিরে আসে।'

'ভাল করেছেন। খবরটা এলেই যেন আমি পাই সে ব্যবস্থা করবেন দয়া করে।

আমি যাচ্ছি এখন মি. লারসেনের অফিসে।'

লারসেনের অফিস থেকেই চিটাগাং-এ আবদুল হাইয়ের কাছে ফোন করল রানা। কিন্তু আসল কথাটাই জানা গেল না। কবীর চৌধুরীর গোপন আস্তানা বের করতে পারেনি আবদুল হাই। কেউ নাকি বলতে পারে না। এইটুকু কেবল জানা গেল, রাঙামাটির সাত-আট মাইল দক্ষিণে প্রায় দুই বর্গমাইল জায়গা কিনে নিয়েছিল কবীর চৌধুরী আট বছর আগে। এখন সব চলে গেছে রিজারভয়েরের পানির তলায়। ওখানে কোন আস্তানা থাকবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

চৌধুরী এখন কোথায়, সে প্রশ্নের উত্তরে হাই বলল, সে গা ঢাকা দিয়েছে। সারা চিটাগাং শহরে ওর চিহ্নমাত্র নেই। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে কোথাও ওর নামে এক আঁচড় কালির দাগও নেই। তবে একবার মোটর পার্টস ইমপোর্ট করবার লাইসেন্স দিয়ে সে অদ্ভুত কতগুলো যন্ত্র···

কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোনের কানেকশন্ কেটে গেল। কিছুক্ষণ বিভিন্ন রকমের শব্দ হওয়ার পর নীরব হয়ে গেল রিসিভার।

এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল আবদুল।

'পেলে কিছু?' লারসেন সাহেবই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন।

'না, হাজুর। ওই তিন জায়গায় না পেয়ে তামাম বাঁধ চষে ফেলেছি আমরা কয়জন। কোথাও কিছু নেই। আর থাকলেও, হাজুর, বুঝবার উপায় নেই।' উর্দু ইংরেজিতে মিশিয়ে বলল ভগ্নমনোরথ আবদুল নিরুৎসাহিত কণ্ঠে।

'আচ্ছা, আবদুল, তুমিতো এই অঞ্চল খুব ভাল করে চেনো। কবীর চৌধুরী বলে কারও নাম শুনেছ কখনও?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'না, হাজুর, এ নাম শুনিনি। দেখলে হয়তো চিনতে পারি।'

'রাঙামাটি এখান থেকে কতদূর?'

'তেরো মাইল।'

'তাহলে কাপ্তাই থেকে পাঁচ-ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাইল দুয়েক জায়গা কিনে নিয়ে একজন লোক···'

'হাঁ, হাজুর! পাগলা এক লোগ ছিল সেখানে। এক টেঙরী খোড়া ল্যাংড়া ছিল। একবার বোড়ো দাবড়ি লাগাইছিল আমাদের। শিকারে গিয়ে···'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে-ই কবীর চৌধুরী। রাতের বেলায় সেই জায়গাটা চিনতে পারবে তুমি প্রয়োজন হলে?'

'ইনশাল্লাহ্। কিন্তু সে সব জমিন তো পানির নিচে চলে গেছে, হাজুর।'

'এক আধটাও উঁচু টিলা কি নেই, যেখানে এখনও পানি ওঠেনি?'

মি. লারসেন মাঝখান থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মনে করেন এক আধটা টিলা যদি পানির ওপর মাথা তুলে থাকেই, সেখানে এখনও লোকটার আড্ডা আছে?'

'তা ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, তবে আমার সেই রকমই সন্দেহ। মোটর বোটে যখন সে এখানে লোক পাঠাচ্ছে, তখন এ সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়।'

রানা ভাবছে, দুটো মাত্র উপায় আছে। এক, ডিনামাইট খুঁজে বের করে অকেজো করে দেয়া। দুই, চৌধুরীর আড্ডা বের করে ওকে বাধা দেয়া।

ডিনামাইট তো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। সেটা পাওয়া গেলে হাতে কিছু সময় পাওয়া যেত। এখন যে-কোন মুহূর্তে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তাই যে করে হোক চৌধুরীর আস্তানা বের করা চাই-ই চাই। এবং আজই রাতে। একমাত্র ভরসা টেলিভিশন ক্যামেরার তার। দেখা যাক, কি দাঁড়ায়। মনের উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করল সে।

রেস্ট হাউসে ফিরে রানা দেখল ঘর খালি। বাথরুমের দরজাও খোলা হাঁ করা। সুলতা নেই। গেল কোথায়! একই মুহূর্তে অনেক চিন্তা ছুটোছুটি করল রানার মাথার মধ্যে। ছুটে গিয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল। কেউ কিছুই বলতে পারল না। কেউ দেখেনি সুলতাকে বেরিয়ে যেতে।

মনে মনে একটা বিষণ্ণ হাসি হাসল রানা। চলে গেছে সুলতা। যাবার আগে অমন অভিনয় না করলেও তো পারত! ঘরটা একেবারে খালি খালি লাগল রানার কাছে। জোর করে মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে শুয়ে পড়ল সে বিছানায় এসে। বিশ্রাম দরকার।

জানতেও পারল না রানা, মাত্র একশো গজ দূরে একটা খালি বাড়ির গ্যারেজের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে অসহায় সুলতা রায়।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় এস.পি. সাহেব এসে ঘুম ভাঙালেন রানার।

'তারের শেষ মাথা পাওয়া গেল?' প্রশ্ন করল উদগ্রীব রানা।

'নাহ্। মাইল পাঁচেক রাস্তার পাশ দিয়ে গিয়ে তারটা চলে গেছে ডানধারে দুর্গম পাহাড়ের ওপর দিয়ে। আমাদের লোক সেই পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল—কিন্তু তারের শেষ আর পায়নি। পানির মধ্যে চলে গেছে তারটা। ওখান থেকেই ফিরে এসেছে ওরা।'

'সন্ধ্যার পর ঠিক যেখানে তারটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে, সেই রাস্তায় আমাকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন, মি. হক?'

'নিশ্চয়ই, এ আর এমন কি কথা হলো।'

হাত-মুখ ধুয়ে নিল রানা। চা খেতে খেতে এস.পি. সাহেব বলেই ফেললেন, 'হঠাৎ কী আরম্ভ হয়ে গেল কাপ্তাইয়ে, মি. রানা, কিচ্ছু তো বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?' সিগারেটে লম্বা এক টান দিয়ে দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন এস. পি.। রানা বলল সব কথা।

'তা হলে তো থানায় ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। পানির লেভেলের অনেক নিচে ফাঁড়িটা—আমার কোয়ার্টারও নিচে। যে কোন মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে আমাদের!' শঙ্কিত এস. পি. বেসামাল হয়ে পড়লেন সব শুনে।

'আপনি নিজের কথা ভাবছেন; লক্ষ লক্ষ মানুষের কী অবস্থা হবে ভাবুন একবার। আর কাল যদি প্রেসিডেন্ট পৌঁছবার পর পরই বাঁধটা ভাঙে, তাহলে?'

'ভয়ঙ্কর, মি. রানা! সাংঘাতিক প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার! এখন লোকটাকে বাধা দেবার জন্যে কি করতে চান? পুলিস ফোর্স দেব আপনার সঙ্গে?'

'তাতে কোন লাভ হবে না। সতর্ক হয়ে গেলেই পালিয়ে যাবে কবীর চৌধুরী ওর আস্তানা থেকে। তারপর যে-কোন জায়গা থেকে রেডিও ট্র্যান্সমিটার দিয়ে উড়িয়ে দেবে এ বাঁধ। ওকে কোন উপায়ে আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে হবে।

ফোর্স নিয়ে গিয়ে লাভ নেই—আমি একা যাব।

আবদুল এসে দাঁড়াল। রানা তখন জিপে উঠে বসেছে।

'আমিও যাব, হাজুর!' আবদুলের কণ্ঠে অনুনয়।

'যে-কোন রকমের বিপদ ঘটতে পারে, আবদুল। তুমি থাকো, একাই যাব আমি।'

'হাজুর, বিপোদ হামি ডোর পায় না; হামি সাথে থাকলে বহোত আসানি হোবে আপনার—পাহাড়ে পাহাড়ে আট বোচ্ছোর চলসি আমি।'

ও. সি.-ও আবদুলের কথায় সায় দিলেন। যে-কোন ভয়ঙ্কর কাজে যেতে এই আবদুলের খোঁজ পড়ে সব সময়। শেষ পর্যন্ত আবদুলের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না রানা। ওকেও নিতে হলো সাথে।

আবদুলের কথার সত্যতা প্রমাণ হলো পাহাড়ে কিছুদূর চলেই। দিনের বেলা হয়তো কষ্টে-সৃষ্টে আছড়ে-পাছড়ে এই পাহাড়ী পথে চলা রানার পক্ষে অসম্ভব হত না, কিন্তু আবদুল না থাকলে এই রাতে সত্যিই চোখে আঁধার দেখত সে। ঝোপ-ঝাড় আর কাঁটার মধ্যে দিয়ে গা বাঁচিয়ে একটার পর একটা উঁচু-নিচু টিলা পার হয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে বন্য জন্তু জানোয়ারের তৈরি পথ পেয়ে যাচ্ছে ওরা—কিছুদূর ভালই চলছে, কিন্তু আবার টেলিভিশন-তারটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বিপথে চলতে হচ্ছে ওদের। দুর্গম গোটা কতক খাড়াইয়ে আবদুল আগে উঠে গিয়ে টেনে তুলল রানাকে।

মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে টেলিভিশনের তার দেখে নিচ্ছে ওরা। হঠাৎ ছুরি বের করল আবদুল। পিছন ফিরে কানে কানে রানাকে বলল, 'পিস্তোল থাকলে রেডি হয়ে যান, হাজুর, কি যেন আসতেছে এদিক!'

দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। আধ মিনিট পর রানা শুনতে পেল সামনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছু একটা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। আবদুলের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির প্রমাণ আগেই পেয়েছিল রানা লারসেনের অফিসে, তাই এত আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়ায় বিস্মিত হলো না। শব্দটা কিসের ঠিক বোঝাও গেল না। হাত দশেক সামনে এসে থমকে থাকল দু'তিন সেকেণ্ড, তারপর ডান দিকে চলে গেল শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ্ মচ্ শব্দ তুলে। কোন বন্য জানোয়ার হবে।

'এদিকে বাঘ-টাঘ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে, হাজুর।'

টর্চ জ্বাললে মাঝে মাঝে ওদের সচকিত করে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ছোট ছোট ভীতু খরগোশ কিংবা শিয়াল। ওরা থামলেই শুনতে পায় আশেপাশে সাবধানী পদক্ষেপ। রানার মনে হলো সবাই যেন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছন পিছন আসছে। হঠাৎ এক-আধটা প্যাঁচা ডেকে উঠছে। অশুভ ইঙ্গিত। ছমছম করে ওঠে গা।

একটা ঠাণ্ডা ভেজা দমকা হাওয়া আসতেই দু'জন এঁকসাথে চাইল আকাশের দিকে। পুব দিকে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু পশ্চিমের আকাশ ঘন অন্ধকার। আসছে কালবৈশাখী ঝড়।

একটু পরেই ঝড় উঠল—তার অল্পক্ষণ পর শুরু হলো বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।

চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়তেই চারিটা দিক সূচীভেদ্য অন্ধকারে ছেয়ে গেল। একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় নিল ওরা। ঠাস ঠাস ডাল ভেঙে হুড়মুড় করে পড়ছে এদিক ওদিকে। রানার রিস্টওয়াচে বাজে সাড়ে আটটা।

'না, আবদুল। আর অপেক্ষা করা চলে না, এরই মধ্যে এগোতে হবে।' আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মনস্থির করে ফেলল রানা।

এবার পথ চলা আরও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। পাহাড়ী আঠাল মাটি পিচ্ছিল হয়ে গেছে বৃষ্টির পানিতে। এক জায়গায় পা ফেললে অন্য জায়গায় চলে যেতে চায়। তার উপর দমকা ঝোড়ো হাওয়া এক ইঞ্চিও এগোতে দিতে চায় না।

উঁচু পাহাড়ের গায়ে গভীর খাদ। তারই পাশ দিয়ে যেতে হবে প্রায় গজ বিশেক। একটু পা ফসকালে একেবারে দু'তিন শ' গজ নিচে গিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ একেবারে ছাতু। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল ওরা। কিন্তু সাবধানেরও মার আছে। হঠাৎ পা পিছলে গেল রানার। এক হাতে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা শিকড় ধরল রানা, কিন্তু তা-ও গেল ছিঁড়ে। চট করে ওর একটা হাত ধরে ফেলল আবদুল, কিন্তু সাথে সাথে নিজেও গেল পিছলে। সড় সড় করে হাত ধরাধরি করে পনেরো ফিট নেমে এসে একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে গেল দু'জন। ঠিক সময় মত আবদুল ধরে ফেলতে না পারলে একেবারে খাদের নিচে গিয়ে পড়ত রানা।

'চোট তো লাগে নাই, হাজুর!'

মৃদু হেসে রানা ভাবল, একেই আমি সন্দেহ করেছিলাম। মনে করেছিলাম, ইসলাম না হয়ে এ-ও সেই লোকটাকে খুন করে থাকতে পারে পানির তলায়!

তিন মাইল এভাবে চলবার পর দেখা গেল সত্যিই পানির মধ্যে চলে গেছে তারটা। বোঝা গেল, আর খুব বেশি দূরে নেই গন্তব্যস্থল।

পানিতে নেমে পড়ল দু'জন। কোয়ার্টার মাইলটাক তার ধরে এগোবার পর সামনে একটা উঁচু পাহাড় দেখা গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ছোট-বড় কালো-সাদা হরেক রকমের মেঘ মাঝে মাঝে চাঁদটাকে আড়াল করছে। যেই হাওয়ায় ভেসে সরে যাচ্ছে মেঘগুলো, অমনি আবার ফিক্ করে হেসে উঠছে চাঁদ, ছোট ছোট ঢেউগুলোর মাথায় ঝিলমিল করছে তার আলো। পাহাড়টার কাছাকাছি আসতেই রানা দেখল পানির নিচে একটা লোহার পোস্ট পোঁতা। সেখানে এসে তারটা পোস্টের মধ্যে ঢুকেছে। পোস্টের চারদিকে হাতড়ে আবার তারটা পাওয়া গেল—সোজা চলে গেছে পাহাড়টার দিকে।

এগোতে গিয়েও কি মনে করে থেমে গেল রানা। আবদুলকে একটু অপেক্ষা করতে বলে দু'হাতে পোস্টটাকে বেষ্টন করে ডুব দিল। একটু পরেই হাত দশেক বাঁয়ে ভেসে উঠল সে। ফিরে এসে পোস্টটা আঁকড়ে ধরে বিশ্রাম নিল সে আধ মিনিট, তারপর বলল, 'আমাদের বাঁ দিকে যেতে হবে, আবদুল।'

'কেন, হাজুর, তার তো গেছে ওই পাহাড়টার দিকে।'

'ওটা একটা ভাঁওতা। ওটা অন্য তার। আসল তার এই থামের দশ ফুট নিচে দিয়ে বেরিয়ে বাম দিকে চলে গেছে। সামনের তার ধরে গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না।'

আবদুলও ডুব দিয়ে হাত দশেক বাঁয়ে ভেসে উঠল। কাছাকাছিই ছিল রানা। বলল, 'এবার আমি ডুব দিয়ে আরও কিছুদূর এগোব তার ধরে, তারপর আবার ডুব দেবে তুমি।'

এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয়শো গজ যাবার পর ধীরে ধীরে পানির ওপর থেকে তারটার দূরত্ব কমে গেল। একটানা এতক্ষণ সাঁতরাবার পর দু'জনেই হাঁপাচ্ছে কামারের হাপরের মত আওয়াজ করে। কিছুক্ষণ চিৎ-সাঁতার দিয়ে এক জায়গায় পানির ওপর ভেসে থেকে জিরিয়ে নিল ওরা। তারপর পা দিয়ে আলতো করে তারটা ছুঁয়ে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে 'ব্রেস্ট্ স্ট্রোক' দিয়ে।

হঠাৎ রানার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সড়াৎ করে বেরিয়ে ওকে জোরে একটা লেজের বাড়ি মেরে নিজেই ভয় পেয়ে পাঁচ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠল একটা মস্ত বড় রুই মাছ। ছপাৎ করে ওটা আবার পানিতে পড়তেই হেসে উঠল আবদুল মৃদুস্বরে।

'হঠাৎ ডর্ লাগিয়ে দিছিল, হাজুর। এ মাছ দু'বরস আগে এ পানিতে ছাড়ল ফিশারী ডিপার্টমেন্ট। সওয়া উনিশ লাখ টাকা খোরচা করছে তিনারা। বিয়াল্লিশ লাখ টাকা ইনকাম্ হোবে, হাজুর। এ বোড়ো আচ্ছা বিজ্নিস।'

আরও আধ মাইল এগোবার পর পানি থেকে আট-দশ ফুট উঁচু একটা টিলার মাথা দেখা গেল। তারটা সোজা চলে গেছে সেই ডুবুডুবু টিলার দিকে।

হতাশ হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আবদুল। একটা আঙুল ঠোঁটের উপর রেখে চাপা স্বরে রানা বলল, ' শ্ শ্ শ্!'

একেবারে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওরা টিলাটার দিকে। দশ গজ বাকি থাকতেই রানা লক্ষ করল টিলার মাথায় কিছু একটা কাঁচের জিনিস চাঁদের আলোয় ঝিক্ করে উঠল একবার। থেমে পড়ল রানা। ওটা একটা রাডার। চারকোণা মুখের এই 'ডেকা' রাডার স্ক্যানার চারদিকে নজর রাখবার জন্যে বড় বড় জাহাজের ব্রিজের ওপর থাকে। টিলার ওপর ঘুরছিল রাডারটা, হঠাৎ রানাদের দিকে চেয়ে থেমে গেল। অবাক বিস্ময়ে যেন প্রশ্ন করছে নীরবে, 'কে তোমরা? কি চাও এখানে?'

ধড়াস করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। আবদুলকে ডুব দেয়ার ইঙ্গিত করে নিজেও ডুব দিল পানির তলায়। কিন্তু এত আলো কিসের? পানির ভেতর চোখ খুলেই টের পেল রানা যে উপরটা এখন আলোকিত। ধরা পড়ে গেছে, পালাবার আর পথ নেই। মরিয়া হয়ে ভেসে উঠল সে উপরে। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। ঠিক এমনি সময়ে শক্ত একটা রশির ফাঁস এসে পড়ল গলায়। কয়েকটা হেঁচকা টানে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে ডাঙায় এসে ঠেকল রানার দেহ। প্রথমেই ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে চুপচুপে ভেজা শোল্ডার-হোলস্টার থেকে বের করে নেয়া হলো পিস্তলটা।

আবদুলকেও একই উপায়ে টেনে আনা হলো—কিন্তু বন্দী হবার আগেই বিদ্যুৎগতিতে কোমর থেকে ছোরা বের করে আমূল বসিয়ে দিল সে সামনের লোকটার বুকের মধ্যে। তীক্ষ্ণ একটা অপার্থিব চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল লোকটা পানিতে। ততক্ষণে ছুরিটা টেনে বের করে নিয়ে আবদুল পাশের লোকটার কাঁকালে বসাতে যাবে, এমন সময় গর্জে উঠল একটা থমসন্ মেশিনগান।

তিন সেকেণ্ড একটানা বিশ্রী শব্দ বেরোল মেশিনগান থেকে। করডাইটের

উৎকট গন্ধ এল নাকে।

চালনির মত ফুটো ফুটো ঝাঁঝরা হয়ে গেল আবদুলের প্রশস্ত বুক। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। লুটিয়ে পড়ল রানার পায়ের কাছে ওর প্রাণহীন দেহটা।

এবার ধীরে ধীরে মেশিনগানের মুখটা ফিরল রানার দিকে। অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেটার মুখ থেকে। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেন রানার বুকের দিকে।

চারদিকে অথৈ জল, আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশী, আর সেই সাথে মৃদুমন্দ জোলো হাওয়া।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো রানার।

আট

নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। আবদুলের কথা ভাববার সময় এখন নয়, তবু নিজেকে মস্তবড় অপরাধী মনে হলো। ওর এই আকস্মিক নির্মম মৃত্যুর জন্যে মনে মনে নিজেকে দায়ী করল রানা। এই মৃত্যুর ফাঁদে কেন সে আনতে গেল ওকে। কবীর চৌধুরীর ভয়ঙ্কর রূপ কি সে চিটাগাং-এই দেখেনি? তবু আজ এ দুঃসাহস করতে গেল কেন সে? আরও অনেক ভাবনা চিন্তা করে অনেক সাবধানে পা বাড়ানো উচিত ছিল ওর। একটু পরেই লুটিয়ে পড়বে ওর প্রাণহীন দেহটা আবদুলের পাশে। তীক্ষ্ণ এক মরণ চিৎকার বেরিয়ে আসবে ওর মুখ দিয়ে। কিন্তু এ মৃত্যুতে লাভ তো কিছুই হলো না। রাহাত খান শুনলে কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে বলবেন 'ফুলিশ'। মেশিনগানধারীর উদ্দেশে মনে মনে বলল, 'জলদি কর্, হারামজাদা, দেরি করছিস কেন, যা করবি কর্ তাড়াতাড়ি!'

'চলো, আগে বাড়ো।' ঠেলা দিল পিছনের লোকটা।

সামনের লোকটাও এবার মেশিনগানের মাথা দিয়ে ডানদিকে ইঙ্গিত করল। 'কোন রকম শয়তানির চেষ্টা করলে ওই নির্বোধ পাঠানের অবস্থা করে দেব। সাবধান।'

দুই পা এগিয়ে কি মনে করে থামল রানা। ঘুরে দাঁড়াল আবদুলের দিকে মুখ করে। মৃতদেহটার দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, 'তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেব, আবদুল, প্রতিজ্ঞা করলাম।' তারপর এগিয়ে গেল সামনে।

টিলার মাথায় সযত্নে ঘাস আর উলুখাগড়া লাগানো বেশ খানিকটা অংশ নিচু হয়ে সরে গেল এক পাশে। সিঁড়ি নেমে গেছে ভিতরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। উজ্জ্বল না হলেও স্বচ্ছ আলোয় আলোকিত ভিতরটা। পাক খেয়ে খেয়ে সতেরো-আঠারো ধাপ নামতেই একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দু'ভাগ হয়ে সরে গেল দরজাটা দু'পাশের দেয়ালের মধ্যে। সামনে প্রশস্ত একটা চারকোণা ঘর। জানালা নেই একটাও, শুধু চার দেয়ালের গায়ে বড় বড় চারটে দরজা।

পরিষ্কার আলোতে এসে আবদুলের হত্যাকারীর দিকে ভাল করে চাইল রানা। লোকটা বেঁটে। খুব বেশি হলে সোয়া পাঁচ ফুট উঁচু হবে। কিন্তু শরীর তো নয়, যেন পেটা লোহা। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট আর শার্ট। হাত আর পায়ের থোকা থোকা

বলিষ্ঠ পেশী দেখলেই বোঝা যায় অসুরের শক্তি আছে ওর গায়ে। মাথায় চুলগুলো কদম ছাঁট দেয়া। ছোট কুঁতকুঁতে ধূর্ত চোখ দুটো যেন জ্বলছে সর্বক্ষণ। চ্যাপ্টা নাকের নিচে কালি মাখানো টুথব্রাশের মত খোঁচা-খোঁচা গোঁফ চেহারার সাথে বেমানান।

ডানধারের দরজাটার সামনে রানাকে ঠেলে নিয়ে যেতেই খুলে গেল সেটা। কোন রকম বোতামের বালাই নেই, সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে দরজাগুলো। খুব ছোট একটা ঘর সামনে। ধাক্কা দিয়ে সেই ঘরের মধ্যে রানাকে ঢোকাল বেঁটে লোকটা। একজন অনুচরের হাতে মেশিনগানটা দিয়ে রানার ওয়ালথারটা নিল নিজে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ওপর দিকটা দেখিয়ে হুকুম করল, 'লাশ দুটো নিয়ে নিচতলায় মর্গে চলে যাও তোমরা সব। আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সেখানে। ওপরে ওঠার আগে রাডার গ্লাসটা দেখে নেবে ভাল করে।'

'ঠিক হ্যায়, সর্দারজী,' একজন উত্তর দিল।

এবার রানার পাশে দাঁড়াল বেঁটে সর্দার। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো বোতামের মধ্যে ডানদিক থেকে তিন নম্বর বোতামটা টিপে দিল লোকটা। নিচু হয়ে রইল বোতামটা অন্যগুলোর চাইতে। নিচে নামতে আরম্ভ করতেই রানা বুঝল ওটা একটা লিফ্‌ট।

লোকটা রানার থেকে মাত্র হাত তিনেক তফাতে। পিস্তলটা আলগা ভাবে রানার পেটের দিকে মুখ করে ধরা। ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি সে অতর্কিতে? প্রতিশোধের এমন সুযোগ কি পাবে সে আর?

'হেঁঃ, হেঁঃ হেঁঃ,' কর্কশ গলার হাসি শুনে রানা ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল বিচ্ছিরি কালো গোঁফটার নিচে ঝক্‌-ঝক্‌ করছে সাদা দাঁত।

'ওসব ধানাই-পানাই ছেড়ে দাও, বাপধন। ভাবছ, ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে ফেলবে আমাকে। শালা, উল্লুকা পাঠ্‌ঠা! একবার চেষ্টা করেই দেখো না কেমন মজা!'

সামলে নিল নিজেকে রানা। সড় সড় করে নেমে চলেছে লিফ্‌ট। চট্‌ করে গুনে নিল রানা মোট নয়টা বোতাম আছে দেয়ালের গায়ে। মনে মনে হিসেব করে ফেলল, এখন হয় সাত তলায় না হয় তিন তলায় নামছে ওরা। আধ মিনিট চলার পর থামল লিফ্‌ট, রানা আন্দাজ করল, তিন তলায় পৌঁছল ওরা। 'ক্লিক' করে একটা শব্দ হতেই যে দরজা দিয়ে লিফ্‌টে ঢুকেছিল তার ঠিক উল্টো দিকে অন্য একটা দরজা খুলে গেল। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়েই একটা দশ ফুট চওড়া মোজাইক করা করিডর। লম্বা প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। দু'পাশে দেয়ালের গায়ে পরপর নম্বর লেখা। কিছুদূর বাঁয়ে যাবার পর একটা গলি দিয়ে দশ গজ গিয়ে ইএল ৩৬৯ লেখা একটা নম্বরের সামনে দাঁড়াল বেঁটে সর্দার। একটা সাদা বোতাম একবার টিপল। প্রায় সাথে সাথেই নম্বরটার কিছু উপরে দু'বার জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। রানাকে এবার দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল লোকটা। নাকটা দেয়ালের গায়ে লাগবার আগেই সরে গেল দেয়াল। সিয়িং আই ফটো ইলেকট্রিক সেলের কারবার।

সেই দরজা দিয়ে মস্ত বড় একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল রানা। অবাক কাণ্ড! এ যেন পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদ। পাহাড়ের ভিতর সবটা এয়ারকণ্ডিশন করা। মেঝেতে ঝকঝকে মোজাইকের টাইলে মিরর পালিশ দেয়া। চারদিকের দেয়াল

হালকা নীল রঙে ডিস্‌টেম্পার করা। বিভিন্ন আকারের অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে প্রকাণ্ড ঘরটায়। গোটা কতক সেগুন কাঠের বড় আলমারি। মোটা মোটা ইংরেজি বই সাজানো তাতে। একটা পড়ার টেবিল। ঘরে কাউকে দেখতে পেল না রানা।

'এসব যন্ত্র হাঁ করে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, মি. মাসুদ রানা। আপনি কেন, পৃথিবীর কেউ কখনও দেখেনি এ যন্ত্র। বুঝিয়ে না দিলে কিছুই বুঝবেন না এর মাহাত্ম্য।' একটা যন্ত্রের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল কবীর চৌধুরী। 'আহা, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন!'

একটা চাকা লাগানো স্টীলের চেয়ারে বসানো হলো রানাকে। চৌধুরীর ইঙ্গিতে একটা নাইলন কর্ড দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো তাকে সেই চেয়ারের সঙ্গে নিপুণভাবে, এক বিন্দু নড়াচড়া করবার ক্ষমতা রইল না আর। সন্তুষ্ট চিত্তে এবার বাঁকা পাইপটা ধরাল কবীর চৌধুরী।

'আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি আমার গবেষণাকেন্দ্র দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনি যেটুকু দেখেছেন তা পুরোটার ছত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এ পাহাড়টাকে লম্বালম্বি চার ভাগ করে নিয়েছি আমি। পাহাড়ের মাথা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে ঘরটায় এসে লিফটে উঠলেন, সে ঘরের চার দেয়ালে চারটে দরজা দেখেছেন—প্রত্যেকটাই লিফট। একটায় উঠে আমার ল্যাবরেটরিতে এসেছেন। অন্য লিফট দিয়ে নেমে অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে যাওয়া যায়। এই রকম আরও তিনটে গবেষণাগারে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করছেন পৃথিবীর দশজন সেরা বৈজ্ঞানিক।এই চার ভাগের প্রত্যেকটি আবার নয়তলা। নিচ থেকে কাজ শুরু করে উপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে আমাদের পুরো পাঁচ বছর সময় লেগেছে। এটাকে একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছোটোখাটো শহর বলতে পারেন।'

'কিসের গবেষণা হচ্ছে আপনাদের এখানে?'

'তা বলতে আমার আপত্তি নেই। তবে তার আগে একটা কথা আপনার জানা দরকার—আপনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। আগামী কাল ঠিক সন্ধে সাতটায় এক অভিনব উপায়ে আপনাকে হত্যা করা হবে। এ খবর জানবার পরেও কি আমাদের গবেষণা সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে?'

'নিশ্চয়ই। মরতে যখন হবে, জেনেই মরি।' ভীত হয়ে পড়েছে এমন ভাব দেখাতে চায় না রানা। 'শুনি, কি নিয়ে পাগলামি চলছে আপনাদের।'

কয়েক সেকেণ্ড রানার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মৃদু হাসল চৌধুরী। বলল, 'বেয়াদবি আমি সহ্য করি না, মি. মাসুদ রানা—চিটাগাং-এ তার প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু এখন আপনাকে আমি কিছুই বলব না। তার কারণ আপনার কথায় কণা পরিমাণ সত্যতা সত্যিই আছে। পাগলামিই বটে। লোভও বলতে পারেন। তীব্র এক ক্ষমতার লোভ। থার্স্ট ফর পাওয়ার। পৃথিবীতে সব মানুষ চায় সার্থকতা। মানবজীবনের সার্থকতা তার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশে। আমি নিজেকে কর্ষণ করে বিরাট ক্ষমতা অর্জন করেছি। কোন মহাপুরুষ যদি অসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মে এবং নিজ প্রতিভাবলে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গোটা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে ইচ্ছেমত ঢেলে সাজাতে চায়, তবে তাকে আপনার মত সাধারণ লোক

তো পাগলই বলবে। বল্টু, তুমি মাসুদ সাহেবকে সমস্ত গবেষণাগার ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে কয়েকটা কাজ সেরে নিই।'

একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ল চৌধুরী। রানাকে চেয়ারসুদ্ধ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বল্টু, কবীর চৌধুরী আবার বলল, 'কেবল ঘুরিয়ে দেখাবে, কারও সাথে কোন কথা বলতে দেবে না।' মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বল্টু। রানা ভাবল, বল্টু! নামটা বড় মানানসই হয়েছে। বল্টুর মতই বেঁটে-খাটো শক্ত-সমর্থ চেহারা লোকটার।

একটা পাহাড়ের মধ্যে যে এমন বিরাট কারবার চলতে পারে তা রানার ধারণার বাইরে ছিল। পথ তো নয় যেন গোলক ধাঁধা। এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে আরেক দিকে; কখনও লিফটে উঠছে, কখনও আপনাআপনি দরজা খুলে গিয়ে পথ তৈরি হচ্ছে। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোজাইক-ফ্লোর। মুখ দেখা যায়। অবাক হয়ে রানা যা দেখল তাতে বুঝতে পারল আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়েকজন সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দিনরাত পাগলের মত পরিশ্রম করছে যেন কী এক নেশার ঘোরে। এত সব যন্ত্রপাতির মধ্যে কেবল গোটা কতক কমপিউটার দেখে চিনতে পারল রানা। বোঝা গেল ফালতু লোক এরা নয়। মিথ্যে ভড়ং করেনি কবীর চৌধুরী। সত্যি সত্যিই বিরাট কিছু কাজ চলেছে এই পাহাড়ের মধ্যে। মিনিট বিশেক পক্ষাঘাতে পঙ্গু রোগীর মত চেয়ারে বসে ঘুরে ঘুরে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। বলল, 'ওহে, বেঁটে বাঁদর, কথা বলতে দিচ্ছ না যখন, তখন কিছুই না বুঝে শুধু শুধু এভাবে বোকার মত ঘোরার কোন মানে হয় না। ফিরে চলো।'

এত তাড়াতাড়ি ওদের ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো চৌধুরী।

'এরই মধ্যে সব দেখা হয়ে গেল?'

'দুই সেকশন দেখেই ফিরে এসেছে,' জবাব দিল বল্টু।

'কিসের গবেষণা হচ্ছে বুঝতে না পারলে শুধু শুধু ঘুরে লাভ?'

'দেখুন, বিজ্ঞান এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে, এত স্পেশালাইজড় হয়ে পড়েছে এর প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা যে, আপনি তো কলা বিভাগের গ্র্যাজুয়েট মাত্র—একজন ভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিকেরও আপনার দশাই হত এই গবেষণাগারে ছেড়ে দিলে। তথ্যগাণিতিকের হিসেবে টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতি দশ বছরে আমাদের এতদিনকার সঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিটা কল্পনা করুন একবার! এবং এই অগ্রগতির সবচাইতে পুরোভাগে রয়েছি আমরা—এই গুপ্ত পাহাড়ের গোপন বৈজ্ঞানিকেরা। এক মহা পরিকল্পনাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছি আমরা দ্রুত সাফল্যের দিকে।'

'সে তো খুব ভাল কথা, কিন্তু এর মধ্যে আবার বাঁধটা ভাঙার মতলব ঢুকল কেন মাথায়?'

'বলছি। তার আগে আমাদের গবেষণার কথা বলে নিই। আমার নিজের রিসার্চ হচ্ছে আলট্রা-সোনিকস। অতিশব্দ। সব কথা আপনি বুঝবেন না—মোটামুটি জেনে রাখুন ভয়ঙ্কর শক্তি আছে এই অতিশব্দের। একে বশে এনে আমি পারমাণবিক অস্ত্রের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী এক অস্ত্র তৈরি করেছি। গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনবার এই আমার প্রথম অস্ত্র। এর ভাল দিকও আছে। সেদিকেও আমার নজর আছে। বিভিন্ন দিক থেকে এই অতিশব্দকে মানব-কল্যাণের কাজে

লাগানো হবে। পরে সে নিয়ে আরও আলোচনা করা যাবে। এখন অন্যান্য গবেষণাগুলো সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে নিই আপনাকে।'

পাইপটা আবার ধরিয়ে নিল চৌধুরী।

'আমার দু'জন জার্মান বন্ধুকে দিয়ে লেভিটেশন-এর গবেষণা করাচ্ছি। লেভিটেশন হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন বা মাধ্যাকর্ষণের ঠিক বিপরীত। কল্পনা করুন, কোন বস্তুকে যদি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবমুক্ত করে দেয়া যায় তবে তার কী অবস্থা হয়। শূন্যে ছেড়ে দিলেও সেটা মাটিতে পড়বে না। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে দুই জার্মান বৈজ্ঞানিক। এ আবিষ্কার বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এক মহা বিপ্লবের সূচনা। হাজারো রকম কাজে লাগানো হবে এই শক্তিকে। কিন্তু সবচাইতে প্রথম আমি ব্যবহার করব একে আমার জেটে। আমার মহাপরিকল্পনাকে সফল করতে আমার প্রয়োজন দ্রুততম ট্রান্সপোর্ট। এরোপ্লেন বলুন আর জেটই বলুন এদের সবাইকে কেবল শূন্যে ভেসে থাকবার জন্যেই প্রায় পঁচাত্তর ভাগ শক্তি নষ্ট করতে হয়। আমার জেট আপনিই ভেসে থাকবে, পুরো শক্তি ব্যবহার করব আমি এগিয়ে যাবার কাজে। বুঝতে পারছেন?'

আত্মতৃপ্তির একটা হাসি ফুটে উঠল কবীর চৌধুরীর মুখে।

'আজকাল বিলেতে ওরা হোভার ক্র্যাফ্‌ট তৈরি করছে জলে ডাঙায় সবখানে চলবার জন্যে। বাতাসকে প্রেশারাইজ্ করে এই গাড়ি মাটি বা পানি থেকে এক ফুট উঁচুতে থাকবে সবসময়—চলবে জেট প্রপালশনে। শুনছি নাকি ইংলিশ-চ্যানেলের উপর হোভার-ক্র্যাফটের ডেইলি-প্যাসেঞ্জারী শুরু হবে অল্পদিনেই। কিন্তু এ সবের চাইতে আমার জেট কতখানি উন্নত হবে ভাবুন একবার।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ পাইপ টানল কবীর চৌধুরী।

'যা বলছিলাম—এই লেভিটেশন। এ ব্যাপারটা পৃথিবীতে নতুন কিছুই নয়; এবং এর প্রিন্সিপলটাও খুবই সহজ। মিশরের পিরামিড হচ্ছে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য বস্তু। আজকে কারিগরি বিদ্যার এত উন্নতির পরও বিংশ শতাব্দীতে আরেকটা পিরামিড তৈরি করা অসম্ভব। কেন জানেন? আজকের বড় বড় এঞ্জিনিয়াররা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও বের করতে পারেনি অত প্রকাণ্ড পাথর অখণ্ড অবস্থায় পিরামিডের অত ওপরে কি করে তোলা সম্ভব হলো। আমার, এবং আমার বন্ধুদ্বয়ের বিশ্বাস, সেই যুগে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ ছ'হাজার বছর আগেই মিশরীয়রা এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল, এবং লেভিটেশনের সাহায্যেই প্রত্যেকটা পাথরকে ওজন-শূন্য করে নিয়ে অত ওপরে উঠিয়েছিল অনায়াসে।'

এসব আজগুবি গল্প নীরবে হজম করে চলেছে রানা। আবার আরম্ভ করল কবীর চৌধুরী।

'আরেক দিকে ছ'জন বৈজ্ঞানিক রিসার্চ করছেন পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে। আমরা আণবিক অস্ত্র তৈরি করতে চাই না। প্রয়োজনের সময় যেন বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ঠুনকো অস্ত্র বানচাল করে দিতে পারি সে উদ্দেশ্যেই এই গবেষণা আমাদের। আটটা বিশাল কম্পিউটারের পাঁচটাকেই ওইখানে দেখেছেন। আর দেখেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক অ্যাটম স্ম্যাশার। এর সাথে তুলনা করা যায় এমন আর একটা মাত্র স্ম্যাশার শুধু পাবেন আমেরিকার ব্রুক হ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে। আমাদের

সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি আমরা এই ব্যাপারে।'

দেয়াল ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে চৌধুরী বলল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই। আলট্রা সোনিক্স গেল, লেভিটেশন গেল, অ্যাটমিক রিসার্চ গেল, এখন অ্যান্টি-ম্যাটার। পৃথিবী বিখ্যাত পদার্থবিদ ডক্টর আর্থার ডুনিং এবং তাঁর স্ত্রী গবেষণা করছেন এ নিয়ে। প্রতিটি অ্যাটমের একটা অ্যান্টি-অ্যাটম আছে। প্রতি···'

'এসব শুনে আমার কোন লাভ নেই,' রানা বাধা দিল, 'তাছাড়া ভালও লাগছে না শুনতে। বুঝলাম, আপনারা কয়েকজন বিকৃতমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক বিকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানের মাধ্যমে। কিন্তু এর সাথে কাপ্তাই বাঁধের কি সম্পর্ক?'

'দুই বর্গমাইল জুড়ে ছিল আমার গবেষণাগার। আরও আটটা অপেক্ষাকৃত নিচু টিলা আমার বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতিসহ ডুবে গেছে পানির তলায়। আর পনেরো দিনের মধ্যে এটাও যেত। তাই উড়িয়ে দিচ্ছি আমি বাঁধটা।'

'লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেজন্যে খুন করবেন আপনি?'

'দেখুন, আমার কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে আমি তৈরি করেছি এই গবেষণাগার। মাত্র কয়েক লক্ষ প্রাণের চাইতে এর দাম আমার কাছে অনেক বেশি। আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে এদেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তখন এই ক্ষতিকে লাভই মনে হবে।' মৃদু হাসল কবীর চৌধুরী। 'পানি এখন চুইয়ে চুইয়ে পাহাড়ের ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আজ দেখি সোডিয়ামের ঘরের দেয়ালও ভিজে স্যাতসেঁতে হয়ে গেছে। অতগুলো ড্রামের সোডিয়ামে যদি কোন ভাবে পানি বা অক্সিজেন ঢোকে, তবে চুরমার হয়ে যাবে সমস্ত পাহাড়।

রানার মনে পড়ল একটু আগে একটা ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় বড় বড় অনেকগুলো ড্রাম দেখেছে সে।

'ইণ্ডিয়ার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কিসের?'

'প্রয়োজনবোধে রামকেও বানরের সাহায্য নিতে হয়েছিল। বাঁধটা ভাঙবার প্রয়োজন যখন হলো তখন তাদের সাহায্য চাইলাম। খুশি হয়ে তারা এগিয়ে এল সাহায্য করতে। তবে তাদের একটা ছোট্ট অনুরোধ: প্রেসিডেন্ট যখন প্রজেক্ট ওপেন করতে আসবে সেই সময় ফাটাতে হবে ডিনামাইট। রাজি হতেই হলো!'

উত্তেজিত রানার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। লোকটা মানুষ না পিশাচ! কি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে যাচ্ছে কথাগুলো!

'আপনার দিন ঘনিয়ে এসেছে, মি. কবীর চৌধুরী। আপনার পরিচয় আর কারও কাছে গোপন নেই। চিটাগাং আর কাপ্তাইয়ের···'

'আমি জানি সে সব। আপনি আমাকে আর আড়ালে থাকতে দেননি। এর ফলে বহু প্রাণ নষ্ট হবে। কিন্তু ওই যে বললেন দিন ঘনিয়ে আসা—সেটা একেবারে অসম্ভব। আপনাকে বলেছি আমার মারণাস্ত্রের কথা। পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ-পাহাড়ের ধারে-কাছে আসে। পাকিস্তানের গোটা মিলিটারি ফোর্সও যদি একসাথে আসে, এক নিমেষে ছাই করে দিতে পারি আমি এই ঘরে বসে শুধু ছোট্ট একটা বোতাম টিপে।'

'কিন্তু বাঁধ আপনি ওড়াবেন কি করে? কড়া পাহারা রয়েছে সেখানে—

ডিনামাইট বসাতেই পারবেন না আপনি।'

বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল কবীর চৌধুরীর মুখে। বলল, 'ডিনামাইটগুলো জায়গা মত বসে আছে, মি. রানা। যে তিন-জায়গা আজ দুপুরে এত লোক নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজালেন, ঠিক তার থেকে তিন গজ করে বাঁয়ে সত্তর ফিট পানির নিচে বসানো আছে ডিনামাইট। বাঁধের গায়ে গর্ত খুঁড়ে সেগুলো বিশ ফুট ঢুকিয়ে দিয়ে আবার মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। কারও সাধ্য নেই ওগুলো খুঁজে বের করে। আগামী কাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে আপনি নিচতলার একটা ঘরে শুয়ে টেলিভিশনে দেখতে পাবেন—শত চেষ্টা করেও আপনি আমাকে রুখতে পারলেন না—বাঁধ আমি উড়িয়ে দিলাম। প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা শেষ করে বোতাম টিপবে, জ্বলে উঠবে সমস্ত বাতি, পরক্ষণেই ঘটবে মহাপ্রলয়। তারপর একটা বোতামে চাপ দিলেই ধীরে ধীরে পানি উঠতে শুরু করবে আপনার ঘরে। চট করে ঘরটা ভরবে না পানিতে—এর মধ্যে আরও অনেক মজা আছে। সবই আমার নিজস্ব উদ্ভাবন। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কতখানি ভয়ঙ্কর এবং বিভীষিকাময় হতে পারে আমার মৃত্যুদণ্ড। আগে থেকে এর বেশি আর কিছুই বলব না, বললে এর আকস্মিকতা কমে যাবে আপনার কাছে।'

'সুলতা কোথায় বলতে পারেন?'

'পারি। কিন্তু আজ আর সময় নেই, মি. মাসুদ রানা। আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল আবার দেখা হবে।'

চেয়ারের বাঁধন খুলে দিতেই উঠে দাঁড়াল রানা। হাত দুটো এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক কাজ করে বসল সে। একলাফে কবীর চৌধুরীর সামনে গিয়ে ওর তলপেট লক্ষ্য করে মারল এক প্রচণ্ড লাথি। ঠিক জায়গা মত পড়লে সাত দিন আর উঠতে হত না চৌধুরীকে বিছানা ছেড়ে। কিন্তু চট করে একটু সরে গেল কবীর চৌধুরী। লাথিটা গিয়ে পড়ল ওর ডান উরুর উপর। খট করে কিছু শক্ত জিনিসের উপর লাগল রানার পা। অবাক হয়ে দেখল রানা চৌধুরীর ডান পা-টা খুলে প্যান্টের ফাঁক গলে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল মেঝের উপর। ওটা একটা কাঠের নকল পা। টাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল চৌধুরীর প্রকাণ্ড দেহটা। এবার বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওর উপর। দুই হাঁটু জড়ো করে ঝপাং করে পড়ল সে কবীর চৌধুরীর পেটের উপর। 'হুঁক' করে একটা শব্দ বেরোল চৌধুরীর মুখ দিয়ে।

ঠিক সেই সময় কানের পিছনে পিস্তলের বাঁটের একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে আঁধার হয়ে এল রানার চোখ। এক ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল বল্টু চৌধুরীর দেহের উপর থেকে। একটা টেবিলের পায়া ধরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আবার কবীর চৌধুরী। ওপাশ থেকে ছুঁড়ে দিল বল্টু রানার ওয়ালথারটা। খপ করে ধরল সেটা চৌধুরী। রানার বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে দেখল রাগে এবং উত্তেজনায় হাতটা কাঁপছে থর থর করে। পিস্তল ফেরত দিয়ে বলল, 'চাবুক বের করো।'

তারপর চলল এক অবর্ণনীয় নির্যাতন। হাত দুটো ছাতের একটা কড়ার সাথে বেঁধে শরীর থেকে সমস্ত কাপড় খুলে নেয়া হলো রানার।

তিন মিনিট ক্রমাগত চাবুক চালিয়ে হাঁপাতে লাগল কবীর চৌধুরী। শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। চৌধুরীর প্রিয় অস্ত্র। চোখ দুটো টর্চের মত জ্বলছে।

তখনও রানার জ্ঞান সম্পূর্ণ হারায়নি। সারা শরীরে বিষাক্ত বিচ্ছুর কামড়ের মত জ্বালা, শরীরের রক্ত যেন সব মুখে উঠে আসতে চাইছে, কান দিয়ে গরম ভাপ বেরোচ্ছে। রানার তীব্র আর্তনাদ তিন মিনিটেই গোঙানিতে পর্যবসিত হয়েছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে এখন ওর।

কপালের ঘাম মুছে নিয়ে আবার শুরু করল কবীর চৌধুরী। শরীরের কোন অংশই বাদ থাকল না আর। চাবুকের লম্বা লম্বা দাগগুলো গায়ের চামড়া চিরে প্রথমে সাদা তারপর লাল হয়ে উঠল। রক্ত গড়িয়ে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। জিভটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রানার।

জ্ঞান হারিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে থাকল রানার জর্জরিত দেহ। সপাং সপাং আরও কয়েক ঘা বসিয়ে থামল কবীর চৌধুরী। রক্তে ভিজে চটচটে হয়ে গেছে চাবুকটা।

মাঝরাতে জ্ঞান ফিরল রানার। অন্ধকার ঘরে একটা খাটের উপর শুয়ে আছে ও চিৎ হয়ে। অসম্ভব তেষ্টা পেয়েছে। পাশ ফিরতে গিয়ে টের পেল হাত-পা খুব শক্ত করে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধা। কপালে হাত না দিয়েও বুঝল গায়ে প্রবল জ্বর। বিস্বাদ হয়ে আছে মুখের ভিতরটা। হঠাৎ ওরকম বোকামি করে ফেলার জন্যে রাগে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ওর। মনে মনে নিজেকে গাল দিয়ে বলল, 'বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে! যেমন কর্ম তেমনি ফল!'

হঠাৎ কানের কাছে বেজে উঠল একটা মিষ্টি সুর। গোটা ঘর যেন ভরে গেল সেই সুর মূর্ছনায়। আরও কয়েকটা শব্দ হতেই রানা বুঝল এ হচ্ছে সরোদের সুর। কেউ সারোদ বাজাচ্ছে। অদ্ভুত মিষ্টি হাত। ভাগ্যিশ এ ঘরের স্পীকারটা 'অন' করা ছিল। বাজনা তো কতই শুনেছে সে, কিন্তু এত ভাল তো কই লাগেনি কখনও আর! মস্ত বড় কোন ওস্তাদের বাজনা হবে হয়তো। দেহ মনের সব জ্বালা সব বেদনা দূর হয়ে যায় এমন মিষ্টি রাগিণী শুনলে। মনে হয় পৃথিবীটা 'মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ'। মিষ্টি চাঁদের আলো, মাতাল হাওয়া, সামনে অথৈ জল, দূরে আবছা গ্রামের আভাস, হিজলের ছায়া, দোল দোল ঢেউ, শাম্পান, আর সেই সঙ্গে তীব্র এক একাকীত্ব।

মধুর একটা আবেশে জড়িয়ে এল রানার চোখের পাতা। মনে হলো লেভিটেশনের সাহায্যে যেন তার দেহটাকে ওজন-শূন্য করে দেয়া হয়েছে।

দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল একটু পরেই। ঘরে এসে ঢুকল বল্টু, সঙ্গে আরও দু'জন লোক। বল্টু বলল, 'চৌধুরী সাহেব তলব করেছেন, একটু কষ্ট করতে হবে হুজুরকে।'

খাট থেকে খুলে আবার পিছমোড়া করে বাঁধা হলো রানার হাত দুটো। দুর্বল পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজের দেহকে বড় ভারি বলে মনে হলো ওর। কিন্তু কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ করল না এদের সামনে। দোতলায় সোডিয়ামের ঘরটা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে এল ওরা। আবার সেই ইএল ৩৬৯, সবুজ বাতি, কবীর চৌধুরীর নির্বিকার মুখ, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল দুই চোখ।

চমকে উঠল রানা ঘরের মধ্যে সুলতাকে দেখে। ওকে দেখেই সুলতা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না—চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ওর দেহ। কেবল বলল, 'তোমাকেও ধরে এনেছে এরা!'

জবাব দিল না রানা; মাথাটা শুধু একটু নিচু করল একবার। দেখল সুলতার দুই চোখের কোনে কালি পড়েছে। অবসন্ন ঘাড়টা যেন মাথাটাকে সোজা রাখতে পারছে না আর।

'সারা রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এরা এই চেয়ারে বসিয়ে, চোখের সামনে বাল্‌ব্ জ্বেলে।'

কথাটা শোনাল ঠিক নালিশের মত। মৃদু হেসে মাথাটা আবার একবার ঝাঁকাল রানা। তারপর কবীর চৌধুরীর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল সে।

'আমার এক অনুচরকে গত রাতে আপনাদের আবদুল হাই বন্দী করেছে চিটাগাং-এ। মিলিটারি আমার বাড়িটা দখল করে নিয়েছে আজ সকালে। তাতে কিছুই এসে যেত না, কিন্তু আমার অনুচরটির কাছে একটা নোট বইয়ে ডিনামাইট ফাটাবার ওয়েভ লেংথ এবং সিগন্যাল কোড লেখা ছিল—সেটাও আবদুল হাইয়ের হস্তগত হয়েছে। এখন একমাত্র ভরসা সুলতা দেবী।'

রানার মনে পড়ল, চৌধুরীর বাড়িতে সুলতা সেই নোট বইয়ে কি যেন লিখে দিয়েছিল। সিগন্যাল কোড এবং ওয়েভ লেংথই হবে বোধহয়।

'আমাদের কারোই জানা নেই সে সিগন্যাল। কিন্তু সুলতা দেবী পণ করেছেন কিছুতেই আমাদের বলবেন না। সারারাত অনেক চেষ্টা করেও বের করা গেল না ওঁর কাছ থেকে। তাই আপনাকে একটু কষ্ট দিতেই হলো, মি. মাসুদ রানা।'

বল্টুকে ইঙ্গিত করতেই রানার জামা কাপড় খুলে নেয়া হলো। পরনে রইল কেবল ছোট একটা আণ্ডারওয়্যার।

রানার দিকে চেয়েই আঁতকে উঠল সুলতা।

'ইশ্‌শ্! মাগো! এই অবস্থা করেছে তোমাকে পিশাচেরা!' সমস্ত গায়ে চাবুকের দাগগুলো এখন কালো হয়ে গেছে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল সুলতার।

তত্ক্ষণে রানার হাত দুটো আবার ছাতের কড়ার সাথে বাঁধা হয়ে গেছে। কবীর চৌধুরীর হাতে কালকের সেই চাবুকটা দেখে ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল রানা একবার।

'সুলতা দেবী! মিটার ওয়েভ এবং সিগন্যাল কোডটা দয়া করে আবার লিখে দিতে হবে আপনাকে। কাগজ কলম তৈরি আছে আপনার হাতের কাছে টেবিলের উপর। যদি এক্ষুণি লিখে না দেন তবে আপনার চোখের সামনে চাবকে খুন করে ফেলব আপনার প্রিয়তম মাসুদ রানাকে। বল্টু, তুমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণবে। এর মধ্যে যদি সুলতা দেবী মত না পাল্টান তাহলে চাবুক মারতে শুরু করব আমি।'

সুযোগ পেয়ে বল্টু খুব দ্রুত এক, দুই, তিন, চার গুণতে আরম্ভ করল। সপাং করে খুব জোরে মাটিতে চাবুকটা একবার আছড়ে নিল কবীর চৌধুরী। চমকে উঠল সুলতা।

'দেব। আমি লিখে দেব!' চিৎকার করে উঠল সে।

'ভুল কোরো না, সুলতা। কিছুতেই লিখে দিয়ো না। তুমি লিখে দিলেও

আমাকে খুন করবে, না দিলেও করবে। এই শয়তানের কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ কোরো না তুমি।'

'তোমাকে এভাবে চাবুক মারবে, কি করে সহ্য করব আমি?'

'চোখ বন্ধ করে রাখো, সুলতা।'

'আমার দুই চোখের পাপড়ি কেটে দিয়েছে—চোখ বন্ধ করতে পারি না। খোঁচা লেগে লেগে ঘা হয়ে গেছে।' হু-হু করে কেঁদে উঠল সুলতা।

মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল রানার। কিন্তু নিরুপায় সে। মনের সমস্ত ঘৃণা দুই চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলল, 'কুত্তার বাচ্চা!'

'শাট্ আপ্!' গর্জন করে উঠল কবীর চৌধুরী। তারপর সুলতার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি যদি এখন লিখে না দেন, তবে আজ হয়তো ড্যাম ওড়াতে পারব না আমি, কিন্তু আগামী কালই আপনার বদলে আরেকজন আসবে ভারত থেকে। কাজেই এভাবে আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। চিন্তা করে দেখুন কোন্‌টা করবেন। এক্ষুণি লিখে দিলে হয়তো আপনাদের দু'জনেরই জীবন রক্ষা পেতে পারে। হয়তো ঢাকায় ফিরে গিয়ে সুখের নীড় বাঁধবার সুযোগ পেতেও পারেন আপনারা।'

'বিশ্বাস কোরো না ওর কথা, সুলতা। মিথ্যে ধোঁকা দিচ্ছে,' রানা বলল।

'বেশ, আপনারা যত পারেন নাটক করুন। আবার দশ পর্যন্ত গোনো, বল্টু। এইবার শেষ সুযোগ দেয়া হবে আপনাকে, সুলতা দেবী।'

এক, দুই, তিন,…আট, নয়, দশ। সপাং, সপাং। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ঘরের মধ্যে দু'বার।

'দোহাই আপনার, বন্ধ করুন। আমি লিখে দিচ্ছি!' কাতরে উঠল সুলতা। তারপর রানার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো, রানা, আমি দুর্বল মেয়েমানুষ মাত্র।'

লিখে দিল সুলতা খশ খশ করে। তারপর বলল, 'কই, আমাদের ছেড়ে দিন এখন।'

হাঃ হাঃ, করে হেসে উঠল কবীর চৌধুরী।

'কি লিখলেন কে জানে! আগে সত্যিসত্যিই বাঁধটা উড়ে যাক, তারপর দেখা যাবে। আর তাছাড়া, তেমন কোন কথা তো আমি দিইনি; বলেছি, হয়তো রক্ষা পেতে পারেন আপনারা। তার মানে, হয়তো রক্ষা না-ও পেতে পারেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা।'

'মিথ্যুক, নীচ, পাষণ্ড!' গর্জে উঠল সুলতা। সাথে সাথেই চাবুকটা পড়ল ওর উরুর উপর। 'মাগো,' তীক্ষ্ণ এক আর্তনাদ। একজন ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল চেয়ারে বাঁধা সুলতাকে। রানা পাগলের মত টানাটানি করল হাতটা ছাড়াবার জন্যে, বাঁধন আরও চেপে বসল কব্জিতে। রানাকেও খুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বল্টু ও তার দুইজন ষণ্ডামার্কা অনুচর। রেডিও ট্র্যান্সমিটারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চৌধুরী।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে রানা। সন্ধে সোয়া ছ'টা বাজে। আর পনেরো মিনিট পরই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে কাপ্তাই ড্যাম। কেউ আর ঠেকাতে পারবে না কবীর চৌধুরীকে। এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গেছেন প্রেসিডেন্ট কাপ্তাইয়ে। মি. লারসেন কি করছেন এখন? ওকে গায়েব হয়ে যেতে দেখে এস.

.পি.-ই বা কি করছেন? নিচু কোয়ার্টার ছেড়ে উঁচু কোন বাসায় উঠে গেছেন বোধহয় এতক্ষণে এস.পি. সাহেব। আর চিটাগাং-এর সদা হাসিখুশি আবদুল হাই? পি. সি. আই.-চীফ রাহাত খান? আর সুলতা?

সুলতার কথা মনে পড়তেই সচকিত হয়ে উঠল রানা। ওর কি কিছুই করবার নেই? নির্যাতন এবং মৃত্যুর তো আরও পনেরো মিনিট দেরি আছে। এই অবস্থাকে স্বীকার করে নিচ্ছে কেন সে? মনে পড়ল রাহাত খানের একটা কথা: 'কোনও অবস্থাতেই কখনও হাল ছেড়ে দিয়ো না, রানা, মনে রেখো, যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কিছু না কিছু উপায় সব সময়ই থাকে।' রানা ভাবল, 'আমার অবস্থায় পড়লে টের পেতে, বাছাধন। সাততলার অফিসে বসে আর উপদেশ খয়রাত করতে হত না!'

কী আজেবাজে কথা ভাবছে সে! মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে সজাগ করবার চেষ্টা করল রানা। হাত এবং পা খাটের পায়ের সাথে টেনে বাঁধা। একটু নড়াচড়া করবার উপায় নেই।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়। আধমিনিট চুপচাপ পড়ে থেকে দেহমনের সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করবার চেষ্টা করল সে। তারপর এক হেঁচকা টানে খাটের ডানধারটা বেশ খানিকটা শূন্যে উঠিয়ে ফেলল। ডানধারটা যেই ফিরে এসে মাটি স্পর্শ করল অমনি আরেক ক্ষিপ্র এবং প্রবল হেঁচকা টানে খাটের বাঁ ধারটা শূন্যে তুলে ফেলতেই উল্টে গেল খাট। উল্টাবার সময় ছয় ইঞ্চি পুরু তোষকটা সড়সড় করে পায়ের তলা দিয়ে সরে গেল ডান দিকে বেশ খানিকটা। বাঁ পা-টা ঢিল পেল ইঞ্চি ছয়েক। সেই পা দিয়ে দুটো লাথি মারতেই গদিটা পায়ের দিক থেকে বেরিয়ে গেল খাটের বাইরে। ডান পা-টাও ঢিল পেল এবার। এবার হাঁটু দিয়ে কয়েকটা ঠেলা দিতেই পিঠের উপর থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল গদিটা। হাত দুটোও ঢিল পেল ছয় ইঞ্চি।

অমানুষিক শক্তিতে হেঁচকা টান দেয়ায় কব্জিতে চেপে বসে গিয়েছিল রশি, মিনিট পাঁচেক ধরে নখ দিয়ে খুঁটবার পর মুক্ত হয়ে গেল ডান হাত। বাঁ হাত এবং দুই পা খুলতে আর এক মিনিট সময় লাগল।

প্রথমেই খাটটা জায়গা মত ঠিক করে রেখে তোষক তুলে দিল রানা খাটের উপর। তারপর বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ খাটে বসে।

হঠাৎ ঘরের এক কোণে একটা বাতি জ্বলে উঠল। চমকে সেদিকে চেয়ে দেখল রানা ওটা টেলিভিশন সেট। কাপ্তাই বাঁধটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাতে। নিশ্চিন্ত মনে লোকজন চলাচল করছে। দু'জন লোক বসা একটা ওয়ান ফিফ্‌টি হোণ্ডা মোটর সাইকেল দ্রুত চলে গেল বাঁধের উপর রাস্তা দিয়ে। স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ কাপ্তাইয়ের পরিবেশ। তবে কি শেষ পর্যন্ত তার কথা অবিশ্বাস্য ভেবে উড়িয়ে দিল মি. লারসেন এবং এস. পি. আতাউল হক?

আর সময় নেই। কয়েক মিনিট পরেই ঘটবে প্রলয়কাণ্ড। উঠে গিয়ে ঘরের দেয়াল পরীক্ষা করে দেখল রানা দরজা খোলার কোন উপায় পাওয়া যায় কিনা। নাহ্। কোন বোতাম নেই ঘরের মধ্যে। হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা। ক্লিক্ করে দরজার তালা খোলার শব্দ পাওয়া

গেল। সাথে সাথেই উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ঘরের মধ্যে। হাতে পায়ে আলগা করে দড়ি পেঁচিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল রানা ঘাপটি মেরে।

পরক্ষণেই ঘরে ঢুকল বল্টু। একা। হাতে একটা প্লেটের উপর কিছু ফলমূল কেটে সাজানো। সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে এগিয়ে এলো বল্টু খাটের কাছে।

'দ্যাখ, হারামজাদা, চৌধুরী সাহেব কত দয়ালু মানুষ। মরার আগেও বিকেলের নাস্তা পাঠাতে ভোলেননি।'

কাঁটা চামচ দিয়ে আপেলের একটা টুকরো তুলে রানার মুখে দিল বল্টু। তারপর হঠাৎ রানার বাঁ গালটা কাঁটা চামচ দিয়ে জোরে আঁচড়ে ছিলে দিল। বলল, 'বেঁটে বাঁদরের খামচি। বুঝলি, শালা হারামখোর?'

টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল রানার গাল বেয়ে গদির উপর। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিল রানা। টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না। কিন্তু দ্বিতীয় টুকরো খাওয়াবার পর যখন আবার নাকে খামচি দিতে এল, তখন এক ঝটকায় কাঁটা চামচটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বল্টুর বাম চোখের মধ্যে বসিয়ে দিল ধাঁই করে।

'গ্যাক্' করে একটা বিটকেল শব্দ বেরোল বল্টুর গলা দিয়ে। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। চামচটা টান দিয়ে বের করে নিতেই রক্ত ছুটল বল্টুর চোখ দিয়ে। তিন চারটে রেখায় নেমে এল সে-রক্ত গাল বেয়ে। রানা চেয়ে দেখল কাঁটা চামচের কাঁটাগুলোয় বল্টুর চোখের ভিতরের অংশ লেগে আছে।

এবার লাফিয়ে উঠে ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরল রানা। তারপর ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালের গায়ে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরল প্রাণপণে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে বল্টুর ডান চোখটা কোটর থেকে। রানার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল সে। ওর আঙুলের নখগুলো বসে গেল রানার কব্জিতে। কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। হাত দুটো ঝুলে পড়ল দু'দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আধহাত জিভ বেরিয়ে পড়ল বল্টুর। পুরো দুই মিনিট পর ছেড়ে দিতেই একটা পা ভাঁজ হয়ে হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ল বল্টুর মৃতদেহ। মৃদু একটা ঘড় ঘড় শব্দ বেরোল বল্টুর গলা দিয়ে। রানা বুঝল, ফুসফুসটা তার স্বাভাবিক অবস্থায় আসবার জন্যে খানিকটা বাতাস গ্রহণ করল বাইরে থেকে।

বল্টুর কাছে কোনও অস্ত্র পাওয়া গেল না। আস্তে করে দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করে দেখল রানা কিছুদূরেই পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কোমরে রিভলভার ঝোলানো একজন প্রহরী। রানার হাত-পা বেঁধেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি চৌধুরী—চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করেছে।

জোরে কয়েকটা টোকা দিল রানা দরজায়। প্রায় সাথে সাথেই অপর পাশে এসে গেল প্রহরী।

'ক্যয়া হ্যায়, সর্দারজী?'

'আন্দার আও!' বল্টুর গলা নকল করবার চেষ্টা করল রানা।

সন্দেহমাত্র না করে অপ্রস্তুত প্রহরী ঘরে ঢুকেই ধাঁই করে নাকের উপর খেলো রানার হাতের প্রবল এক মুষ্ট্যাঘাত। নাকের জল আর চোখের জল এক হয়ে গেল প্রহরীর। ততক্ষণে ওর কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়েছে

রানা। লোকটা একটু সামলে নিতেই ওর দিকে রিভলভারটা ধরে রানা বলল, 'এই ঘরের চাবিটা বের করো ভালয় ভালয় নইলে ওই অবস্থা করে দেব।'

বল্টুর বীভৎস চেহারার দিকে চেয়ে শিউরে উঠল প্রহরী। বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে চাবি বের করল, 'ওখানেই মাটিতে রাখো চাবিটা। তারপর খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

খাটের সাথে বেঁধে ফেলল রানা প্রহরীকে। তারপর রিভলভারটা ওর বুকের সাথে ঠেসে ধরে বলল, 'সুলতা রায় কত নম্বর রুমে আছে?'

'হামি জানে না, সারকার।'

'আলবাত জানে।' রিভলভার দিয়ে একটা খোঁচা দিল রানা ওর পাঁজরে, 'কাল যে জানানাকে ধরে নিয়ে এসেছে তাকে কোথায় রেখেছে?'

'ওহ-হো, উও আওরাত? সে তো চার তলার উপর।'

'কত নম্বর রুম?'

'দো শও ছাপ্পান্।'

আর দেরি করা চলে না। পথটা জানাই আছে। ঘরটায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে তিন তলায় উঠে এল রানা। পথে কাউকে দেখা গেল না। আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা বোধহয় কম এখানে। ইএল ৩৬৯-এর সামনে এসে বোতামটা টিপল রানা একবার। সাথে সাথেই দু'বার জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। আপনা আপনি খুলে গেল দরজাটা।

'কি খবর, বল্টু?' রেডিও ট্র্যান্সমিটারের একটা বোতামের ওপর বুড়ো আঙুলটা রেখে ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে আছে কবীর চৌধুরী। রানাকে তাই দেখতে পেল না সে। আবার বলল, 'আর আধ মিনিট, বল্টু! তারপরই ওই টেলিভিশনে দেখতে পাবে...'

হঠাৎ ট্র্যান্সমিটারটা রানার এক লাথিতে ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লাগল। সেখান থেকে মাটিতে পড়ে দুই টুকরো হয়ে গেল। হতভম্ব চৌধুরী উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। সাথে সাথে ব্যান্টামওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাসুদ রানার একটা নক্ আউট এসে পড়ল একেবারে নাক বরাবর। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল নাক দিয়ে। এবার প্রচণ্ড এক লাথি চালাল রানা। লাথি খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল কবীর চৌধুরী। তক্ষুণি রানার গুলি করা উচিত ছিল, কিন্তু তা না করে, এমনিতেই কাবু করে এনেছে ভেবে যেই আরেকটা লাথি মারতে গেছে অমনি খপ করে পা-টা ধরে ফেলল চৌধুরী। পা ধরে জোরে একটা মোচড় দিতেই পড়ে গেল রানা মাটিতে। রিভলভারটা ছিটকে হাত দুয়েক দূরে পড়ল।

'এবার? এখন কোথায় যাবে?'

দাবার ছকটা এক মুহূর্তে পাল্টে গেল যেন। হাতী, নৌকো, মন্ত্রী নিয়ে চারদিক থেকে অপর পক্ষের রাজাকে আটকে নিয়ে যেন দেখা গেল সামান্য ঘোড়ার এক আড়াই চালে নিজেই কিস্তি মাত হয়ে বসে আছে। রানার পা-টা ভেঙে ফেলবার জোগাড় করল কবীর চৌধুরী। এক পা খোঁড়া হলে কি হবে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে ওই প্রকাণ্ড দেহে। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো রানার।

হঠাৎ কি যেন ঠেকল হাতে। তুলে দেখল সেই চাবুকটা। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল রানার মধ্যে। শুয়ে শুয়েই নৃশংসভাবে চাবুক চালাল সে।

ব্রিজ খেলায় ট্রাম্পের উপর দিয়ে ওভার-ট্রাম্পের মত অবস্থা হলো এবার। কবীর চৌধুরীর দুই হাত বন্ধ। চাবুক বাঁচাতে পা ছাড়লেই রানা রিভলভার তুলে নেবে। হেরে গেল চৌধুরী। সাঁই সাঁই চাবুক পড়ছে ওর মুখে-গালে-গলায়-হাতে। নরম মাংস পেয়ে কেটে বসে যাচ্ছে চাবুকটা। তীব্র জ্বালা সহ্য করতে না পেরে রানার পা ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে লুকাল কবীর চৌধুরী একটা বড় আলমারির পিছনে। রানাও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রিভলভারটা কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে, তারপর সেটা বাগিয়ে ধরে বলল, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, কবীর চৌধুরী।'

কিন্তু কোথায় চৌধুরী? কেউ নেই আলমারির পিছনে। 'ক্লিক' করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ কানে আসতেই রানা বুঝল অদৃশ্য হয়ে গেল কবীর চৌধুরী আলমারির পিছনে দেয়ালের গায়ের কোন গুপ্ত দরজা দিয়ে।

ছুটে বেরিয়ে এল রানা সে ঘর থেকে। এবার চারতলার দু'শো ছাপ্পান্ন নম্বর ঘর। লিফটে করে উঠে এল চারতলায়। কিন্তু সেখানে নম্বরগুলো সবই ছ'শোর উপরে। রানা ভাবল, মিছে কথা বলল না তো লোকটা? আচ্ছা, অন্য ব্লকের চার তলায়ও তো রাখতে পারে সুলতাকে!

লম্বা করিডরটার ঠিক মাঝামাঝি এসেই অন্য ব্লকের রাস্তা পেল রানা। এবার দৌড়াতে আরম্ভ করল সে। দেরি হলেই ধরা পড়ে যাবে।

এমন সময় অ্যালার্ম সাইরেন বেজে উঠল পাহাড়ের মধ্যে। সবাইকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে। একটা মোড় ঘুরতেই দেখল একজন প্রহরী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওর দিকেই আসছিল—ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে রিভলভার বের করতে যাচ্ছে। গুলি করল রানা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে। কাছে গিয়ে দেখল রানা শেষ হয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে লেখা পিএমকে ২৫৪। চটপট প্রহরীর রিভলভার আর চাবির গোছা নিয়ে এগিয়ে গেল রানা। আর মাত্র দুটো ঘর বাদেই দু'শো ছাপ্পান্ন।

তেমনি চোখ খুলে বসে আছে সুলতা চেয়ারে বাঁধা অবস্থায়। চাবি খোলার শব্দ শুনে নতুন কোন নির্যাতনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল মনে মনে—রানাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে রানা বলল, 'জলদি উঠে পড়ো, সুলতা। কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না এখন। সবাই সজাগ হয়ে গিয়েছে। যে করে হোক বেরোতে হবে আমাদের এখান থেকে।'

'তুমি! কি করে ছাড়া পেলে, রানা!'

'সব বলব পরে। এখন উঠে পড়ো, লক্ষ্মী। একটুও সময় নেই—দেরি করলেই আবার ধরা পড়তে হবে।'

ছুটল দু'জন লিফটের দিকে। উপরের দিকে না গিয়ে দুই নম্বর বোতাম টিপল রানা। লিফট থেকে নামতেই কবীর চৌধুরীর গলা শুনতে পেল লাউড-স্পীকারে। সমস্ত পাহাড়ের লোককে নির্দেশ দিচ্ছে সে।

'দোতলায় ছোট সবাই। ওরা ওপর দিকে যায়নি। দোতলায় সোডিয়ামের ঘরের দিকে যাচ্ছে এখন। যে যেখানে আছ দোতলায় যাও। যার সামনে পড়বে সে-ই গুলি করবে।' ইনফ্রা রেড রে-র সাহায্যে রানার গতিবিধি টের পাচ্ছে চৌধুরী পরিষ্কার।

মস্ত বড় বড় টিনের ড্রামের মধ্যে সোডিয়াম রাখা। আকারে একেকটা

আলকাতরার ড্রামের তিনগুণ হবে। পাশাপাশি আটটা ড্রামের পেট বরাবর গুলি করল রানা। ড্রাম ফুটো হয়ে গিয়ে কলের জলের মত কেরোসিন তেল বেরিয়ে মেঝেতে পড়তে আরম্ভ করল। রানা জানে অক্সিজেন থেকে বাঁচাবার জন্যে কেরোসিন তেলের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হয় সোডিয়াম। এই তেল বেরিয়ে গেলেই অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে গরম হয়ে উঠবে সোডিয়াম—তারপরই ঘটবে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। 'তার আগেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে যেমন করে হোক,' ভাবল রানা।

কিন্তু বেরোবে কোনদিক দিয়ে? পাহাড়ের উপর দিকটা এতক্ষণে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে ফেলেছে কবীর চৌধুরী। উপরে উঠতে গেলেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। তাহলে? এখন এগোবেই বা কোনদিকে?

চারদিক থেকে লোকজনের হৈ-হল্লা এবং পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা বিভলভার ফেলে দিল রানা। গুলি শেষ। এখন অবশিষ্ট রিভলভারের তিনটে গুলিই সম্বল।

সুলতার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা ডান দিকে সেই তেল চুপচুপে মেঝের উপর দিয়ে। কিছুদূর গিয়েই মোড় ঘুরেছে রাস্তাটা। সেখানটায় এসেই রানা দেখল তিন চারজন লোক এগিয়ে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। এত কাছে জলজ্যান্ত ওদের দু'জনকে সামনে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল লোকগুলো। পর পর দুটো গুলি করে দু'জনকে ধরাশায়ী করল রানা। আর বাকি দু'জন তীরবেগে ছুট দিল উল্টো দিকে জানপ্রাণ নিয়ে। পিছন থেকে বহু লোকের হৈ-হল্লা এগিয়ে আসছে দ্রুত। সেই সঙ্গে খুব কাছ থেকে লাউড স্পীকারে কবীর চৌধুরী বলছে, 'মাসুদ রানা এখন একতলার সিঁড়ির কাছে। আর মাত্র একটা গুলি আছে ওর রিভলভারে। এগিয়ে যাও।'

কয়েক পা গিয়ে সত্যিই সিঁড়ি পাওয়া গেল। তর তর করে নেমে এল ওরা একতলায়। এখন? এক দিকে গজ বিশেক গিয়ে শেষ হয়েছে করিডর। সেই দিকেই দৌড় দিল রানা পাগলের মত।

হাঁফাতে হাঁফাতে সুলতা বলল, 'হাতটা একটু ছাড়ো। খুব লাগছে।'

চট করে হাত ছেড়ে দিল রানা। উত্তেজনার বশে সুলতার কব্জিটা প্রায় গুঁড়ো করে দেবার জোগাড় করেছিল ও।

এক সঙ্গে কয়েকটা পিস্তল গর্জে উঠল। দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে রানা দেখল প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন লোক এগিয়ে আসছে। লাউডস্পীকারে কবীর চৌধুরী বলল, 'এবারে মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও, মাসুদ রানা। বাধা দিয়ে আর লাভ নেই।'

দেয়ালের গায়ে হাতড়ে যে বোতাম খুঁজছিল রানা পেয়ে গেল সেটা। টিপতেই সরে গেল দেয়ালটা একপাশে। সুলতাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

'আমাদের বোধহয় ওপর দিকে যাওয়া উচিত ছিল,' বলল সুলতা।

তখন আর কথা বলবার বা কারণ ব্যাখ্যা করবার সময় নেই। ছুটে গেল রানা ঘরের অপর দেয়ালের কাছে। টিম টিম করে একটা বাতি জ্বলছে ঘরে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখ। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। হাত দিয়ে দেখল দেয়ালটা ভেজা।

'শিগগির আমার কাছে এসো, লতা। খুব কষে আমাকে জড়িয়ে ধরো। জলদি। সময় নেই।'

দেয়ালের সাথে লাগানো একটা লোহার কড়া এক হাতে শক্ত করে ধরল রানা। দেখল ওর গায়ের সাথে সেঁটে থাকা সুলতার দেহ থর থর করে কাঁপছে ভয়ে। তারপরই বোতাম টিপে দিল রানা। দুরু দুরু করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা অজানা আশঙ্কায়। কি ঘটতে চলছে সে-ই কি জানে ভালমত?

পানি! ভয়ানক জোরে পানি এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। ভাগ্যিস পানির তোড়টা প্রথমে গিয়ে ধাক্কা খেল অপর দিকের দেয়ালে, নইলে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না ওরা। এক সেকেণ্ডেই কোমর পর্যন্ত উঠে এল পানি। বোতামটা ছেড়ে দিল রানা। ততক্ষণে পানি উঠে এসেছে গলা পর্যন্ত। বন্ধ হয়ে গেল পানি আসবার পথটা।

এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রানা বলল, 'সাঁতার জানো, সুলতা?'

'না জানি না। কিন্তু এত জল কোত্থেকে এল ঘরের মধ্যে?'

'এই পাহাড়টার চারদিকেই পানি। আমরা পানির লেভেলের প্রায় নব্বই ফিট নিচে আছি এখন। পাহাড়টার চারপাশ যখন শুকনো ছিল তখন এই পথ ছিল বাইরে যাতায়াতের জন্যে। এটা আসল গেট না হয়ে কোন গুপ্ত পথও হতে পারে। এই পথেই আমাদের এখন বেরোতে হবে বাইরে।'

ঠিক এমনি সময়ে যে দরজা দিয়ে ওরা এ ঘরে ঢুকেছিল সেই দরজা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। অতর্কিত পানির এক ধাক্কায় দরজার সামনের লোকটা ছিটকে সরে গেল। সাথে সাথেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'আমার সমস্ত শরীর জ্বালা করছে পানি লেগে। আমি আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না, সুলতা। তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের সব কাজ। আমি যখন বলব তখন লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে নেবে। বোতাম টিপলেই দরজা খুলে গিয়ে ঘরটা ভরে যাবে পানিতে। সবটা না ভরলে স্থির হবে না পানি, আমরা পানির তোড় ঠেলে বেরোতে পারব না। পানি স্থির হলে আমরা এই পথ দিয়ে বেরিয়ে সাঁতরে উঠব ওপরে, বুঝলে? ততক্ষণ দম বন্ধ করে রাখতে হবে।'

'এত নিচ থেকে ওপরে উঠবে কি করে আমাকে নিয়ে? আমাকে না হয় এখানে ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে যাও।'

'পাগল! বাজে বকো না, লতা। তোমাকে ছেড়ে গিয়ে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাই না। তার চেয়ে এসো দু'জন একসাথে চেষ্টা করি—মরি যদি, একসাথে মরব।'

'আশ্চর্য মানুষ তুমি, রানা।'

'বিয়ের রাতে আমার অনেক প্রশংসা কোরো—এখন তোমার শাড়ি খানিকটা ছিঁড়ে চারটে ছোট ছোট টুকরো করো তো। ওগুলো কানের মধ্যে গুঁজে না নিলে এত গভীর পানিতে চাপ লেগে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে।'

নতুন শাড়িটা ছিঁড়তে এক মুহূর্ত একটু দ্বিধা করল সুলতা। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো! তারপরই রানার কথা মত কাজ করল।

রানা বলল, 'রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল সুলতা।

এক হাতে সুলতাকে জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে সাঁতার কাটছে রানা উপরে উঠবার জন্যে। পা দুটো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারছে না—বেধে যাচ্ছে সুলতার শাড়িতে, পায়ে।

শেষের তিরিশ ফুট মনে হলো যেন আর শেষ হবে না। একে নির্যাতনে দুর্বল শরীর, তার উপর এই অমানুষিক পরিশ্রম—বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে রানার। কপালের দুই পাশে দুটো শিরা দপ-দপ করছে। প্রাণপণে সাঁতরে চলল রানা। নিজের কষ্ট ভুলে মনে মনে ভাববার চেষ্টা করল সুলতার কতখানি কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু এই ওপরে ওঠার কি শেষ নেই? ফুট দশেক থাকতেই হাল ছেড়ে দিল রানা। আর পারা যায় না। ধীরে ধীরে নামতে আরম্ভ করল আবার ওরা। এভাবে নামতে ভালই লাগছে রানার। ঘাড়ে, গলায়, কানের পাশে সুড়সুড়ি লাগছে পানি লেগে। হঠাৎ সুলতা একটু নড়ে উঠতেই হুঁশ হলো রানার। শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে একবার। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে যেন কেউ। আবার উঠতে থাকল ওরা ওপরে। ইয়াকুবের মুখটা একবার ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায় কেন জানি।

ওপরে উঠে নাক মুখ দিয়ে অনেক পানি বেরোল সুলতার। দু'জনেই খানিকক্ষণ হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিল বুক ভরে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গোধূলির সব রঙ মুছে গেছে মেঘের ফালি থেকে। আবছা চাঁদের আলোয় পনেরো গজ দূরে পাহাড়ের ছোট্ট মাথাটা দেখে যেন জ্ঞান ফিরে পেল রানা। পালাতে হবে। এই অভিশপ্ত পাহাড়ের কাছ থেকে পালাতে হবে দূরে। মনে পড়ে গেল গতরাতের অভিযানের কথা, আবদুলের কথা। এখনও 'ডেকা' রাডার স্ক্যানার ঘুরছে টিলাটার চূড়ায়।

সুলতার মাথা পানি থেকে অল্প একটু ভাসিয়ে রেখে 'ব্যাক্‌স্ট্রোক' দিয়ে পিছনে সরে যেতে শুরু করল রানা।

হঠাৎ পাহাড়ের মাথায় কবীর চৌধুরীর প্রকাণ্ড দেহটা দেখে চমকে উঠল রানা। কবীর চৌধুরীও দেখল ওদের। তারপর ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। দ্রুত এগিয়ে আসছে চৌধুরী ওদের দিকে।

এইবার প্রমাদ গুণল রানা। একটা মাত্র গুলি আছে ওর রিভলভারে। কবীর চৌধুরীর তা অজানা নেই। যদি এক গুলিতে ওকে ঘায়েল করা না যায় তবে ওর হাতে নিশ্চিত মৃত্যু হবে দু'জনের। কাজেই আগে গুলি ছুড়বে না বলে স্থির করল রানা। কবীর চৌধুরীর মনে গুলি খাওয়ার ভয় থাক কিছুটা।

কিন্তু চৌধুরী নিজে আসছে কেন লোক না পাঠিয়ে? ও নিশ্চয়ই টের পেয়েছে সোডিয়ামের ড্রাম ফুটো হবার কথা। তাই কাউকে কিছু না বলে সরে আসছে পাহাড় থেকে। সেই সাথে ওর সব কিছু ধ্বংস করে দেয়ার প্রতিশোধটাও তুলে নেবে।

প্রাণপণে ব্যাক্‌স্ট্রোক দিয়ে চলল রানা—সেই সাথে পা দুটো চলছে প্রপেলারের মত। কিন্তু এক হাতে কত আর সাঁতরাবে সে? তার উপর সুলতার ভার। এখন মনে হলো আরও একটা গুলি অন্তত হাতে রাখা উচিত ছিল।

ধীরে ধীরে দূরত্ব কমে আসছে ওদের। পনেরো গজ দূরে থাকতেই প্রথম গুলি

করল কবীর চৌধুরী। রানা অনুভব করল ওর হাতের মধ্যে হঠাৎ সুলতার দেহটা অস্বাভাবিকভাবে চমকে উঠল। পরক্ষণেই রানার চোখে মুখে কি যেন ছিটে এসে পড়ল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা আর। তাড়াতাড়ি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিল রানা চোখমুখ। হাতে লাগল চটচটে কি যেন।

হঠাৎ কি মনে হতেই আঁতকে উঠে সুলতার মুখের দিকে চাইল রানা। দেখল মাথাটা হেলে পড়েছে এক দিকে। হ্যাঁ! অব্যর্থ চৌধুরীর হাতের টিপ। তাজা রক্ত আর মগজের অংশ ছিটকে বেরিয়ে এসে লেগেছিল রানার চোখে মুখে।

রিভলভার বের করল রানা। কিন্তু সামনে কি যেন দেখে এগোনো বন্ধ করেছিল কবীর চৌধুরী। রানা গুলি করবার আগেই ডুব দিল পানির মধ্যে।

প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। গুলি করল রানা। দূর থেকে একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এল। চলে গেল কবীর চৌধুরী।

সামনে যতদূর দেখা যায় কেবল জল আর জল। মেঘবিহীন বৈশাখের আকাশে নিঃসঙ্গ পূর্ণিমার চাঁদ। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের মুকুট। ফুর ফুর করে বইছে পুবালী হাওয়া। মাথার উপর দিয়ে বাদুড় উড়ে গেল একটা।

চাঁদের আলোয় নিষ্প্রাণ সুলতার মলিন মুখটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রানা। ছোট্ট একটা চুম্বন এঁকে দিল ওর কপালে। তারপর ছেড়ে দিল পানির ভেতর। দ্রুত নেমে গেল দেহটা নিচে। সুলতার চিহ্নও থাকল না আর। নিজেকে বড় অসহায় একা মনে হলো রানার। হু-হু করে উঠল বুকের ভিতরটা এক অবর্ণনীয় বেদনায়। অবসন্ন দেহটাকে ভাসিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছে খুব।

কিন্তু কিসের এক মোহে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাঁতার কাটতে থাকল রানা—জায়গাটা ছেড়ে কিছুতেই চলে যেতে পারছে না ও।

হঠাৎ বেশ কাছ থেকে কয়েকটা টর্চের উজ্জ্বল আলো পড়ল রানার চোখের উপর। চোখটা ধাঁধিয়ে যাওয়ায় কিছুই দেখতে পেল না ও সামনে। কানে এল কে বলছে, 'ওই যে, আরেক ব্যাটাকে পাওয়া গেছে। মেশিনগান রেডি রাখো, এর কাছেও পিস্তল থাকতে পারে। সাবধানে ঘিরে ফেলো নৌকা দিয়ে।'

স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদে ডুব দিতে যাবে রানা—এমন সময় কানে এল আবদুল হাইয়ের পরিচিত স্বর।

'আরে, এ যে দেখছি মাসুদ রানা! এই, লতীফ, জলদি কাছে নিয়ে চল শাম্পান! আপনি এখানে কি করছেন, মাসুদ সাহেব?'

রানা জবাব দিতে চেষ্টা করল কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। রানার মুমূর্ষু দেহটা তিনজনে টেনে তুলল নৌকার উপর। ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো কাছেই কোথাও। রানা চেয়ে দেখল অভিশপ্ত পাহাড়ের চুড়োটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে পানির নিচে। মস্ত বড় বড় ঢেউ উঠল বিশাল রিজারভয়েরের গভীর হৃদয় মন্থন করে।

বিস্মিত আবদুল হাই বলল, 'কী হলো! ভয়ঙ্কর এক্সপ্লোশন হলো বলে মনে হচ্ছে!'

এবারও কোন জবাব দিতে পারল না রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল নৌকোর পাটাতনে শুয়ে।